১৫ মে ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

শনিমেলা

গ্ল্যাক্সো'র অবদান
নিমেষে শক্তি যোগানের
অপূর্ব পানীয়—
কমলা লেবুর চমৎকার স্বাদে!
ভিটামিন সি'র
গুণে ভরপুর!
মাস্থির চিনি
মেশানোর
দরকারই নেই
এখন আপনার বাচ্চাকে দিন নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়, যা কমলা লেবুর চমৎকার স্বাদে ভরা।
নতুন গ্লুকন-সি'তে রয়েছে গ্লুকোজ, যাতে আছে চটপট শক্তি যোগানের খাদ্যগুণ, যা আপনার বাচ্চাকে সুস্থ-সবল স্বাস্থ্যে, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরিয়ে রাখে।
এতে রয়েছে ভিটামিন সি'র ভরপুর গুণ, যা বাচ্চাদের দাঁত, শরীরের হাড় ও টিস্যু সবল গড়ে তুলতে একান্তই দরকার।
এক গ্লাস বরফ-ঠাণ্ডা জলে চার চা-চামচ গ্লুকন-সি গুলুন, আর দেখুন কমলা লেবুর চনমনে স্বাদের তরতাজা করা কি অপূর্ব পানীয় না তৈরী হ'ল। এই চমৎকার পানীয় আপনার বাচ্চাকে দিন রোজই—দু'বার করে।
আর দেখুন, এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়ের জন্যে ও কেবলই আবদার করে।
GLUCON-C
The unique, refreshing instant energy drink with a tangy orange taste.
Ingredients:
ARTIFICIALLY COLOURED AND ARTIFICIALLY FLAVOURED
Glaxo
GLL-1174 R
গ্লুকন-সি

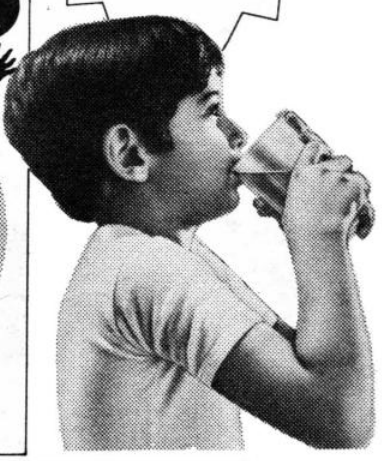

আনন্দমেলা

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ ।। ১৫ মে ১৯৮৫ ।। ১১ বর্ষ ৩ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
কোদণ্ডের টঙ্কার । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৫
গল্প
বুরু । সঙ্কর্ষণ রায় ৭
শুগারবিলির গল্প । সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
শিবুখুড়োর দুধেলা গাই । স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১
মাল্টিপারপাস মামা । বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৪
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৭
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
শার্লক হোমসের গল্প
বুটিদার ফেট্টি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৪৫
ছড়া ও কবিতা
পুতুলের বিয়ে । কমলেন্দু দাক্ষিত ১১
রাগ-রাগিণী । রতন সন্যায়মত ১৫
দুটি ছড়া । জ্যোতিভূষণ চাকী ৩৩
ঘড়ির কোকিল । অভীক বসু ৩৩
বনের রাজা । শিবময় দাশগুপ্ত ৩৩
বিজ্ঞানবিচিত্রা
লেখার পালা (এলাম আমি কোথা থেকে) । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
বিদ্যালয়-পরিচিতি
দমদম কিশোরভারতী উচ্চ-বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ২২
লেখাপড়া
কবিতা লেখা কি সহজ (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৩০
মৌলী···ফৌত (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৩০
খেলাধুলো
পি কে'র সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা । নৃপতি চৌধুরী ৬২
শাস্ত্রীর বাঁ হাত । অশোক রায় ৬৩
দুই সকালে দুই শিবিরে । সুজয় সোম ৬৪
ফুটবলাররা ঘুমিয়ে রইলেন । সম্রাট রায় ৬৫
সাত, আট আর নয় । রাজা গুপ্ত ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০
অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৫০, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সঞ্চয় করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই ।
পড়াশুনা করে করো জ্ঞান সঞ্চয়
গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ
এখন থেকে করো অর্থ সঞ্চয়
ভবিষ্যৎ হবে সুনিশ্চিত ।

ক্যারিঅন
সেভিংস এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
আম্রপালী ভবন
১০/২, ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলিকাতা—৭০০ ০২৭ ফোন : ৪৫-২২৯৯

নতুন

দুধযুক্ত
ফ্যারেক্স
শক্ত আহারের
দুটি টিনের সঙ্গে!

নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু
নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্যে উপকারী।

নির্বাচিত কয়েকটি শহরে, বিশেষ উপহারের টিনের ওপর
স্টক থাকা পর্য্যন্তই এসুযোগ পাওয়া যাবে।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/5/244 BEN

লেখার পালা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ বছর জলে জলে ঘুরে 'বিগল্' জাহাজে দেশে ফিরলেন ডারউইন। এবার শুরু হল তাঁর একটানা লেখার পালা। একটাই তাঁর বিষয়: জীবজগতের জন্মবৃত্তান্ত। জীবজগৎ সম্বন্ধে তাঁর নিজের এবং অন্যদের আবিষ্কৃত যাবতীয় তথ্য একের পর এক তিনি নথিবদ্ধ করলেন। এই অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে একটা কথাই প্রমাণ হল : সমস্ত জৈব পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে একই পূর্বপুরুষদের থেকে।

এক জাত থেকে অন্য জাত—এইভাবে ক্রমান্বয়ে ঘটেছে রূপান্তর ; বিবর্তনবাদের এই সত্যকে ডারউইন তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিবর্তনের কথা ডারউইনের আগেও কেউ-কেউ বলেছেন। তার মধ্যে তাঁর ঠাকুর্দাও ছিলেন একজন। কিন্তু তিনি ছাড়া আর কেউ দুনিয়াকে স্বমতে আনতে পারেননি।

ডারউইন পেরেছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত, তিনি অসংখ্য তথ্য যোগাড় করে একসঙ্গে এমনভাবে গাঁথলেন যে, তা থেকে মালার মতো ফুটে উঠল পৃথিবীর ইতিহাস। দ্বিতীয়ত, তিনি শুধু 'হয়' বলেই ক্ষান্ত হননি। সেই সঙ্গে 'কেন হয়' 'কেমন করে হয়'—সেটাও তিনি ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই মতবাদের তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। সে-কথা পরে আসবে।

১৮৫৯ সালে বার হয় তাঁর যুগান্তকারী বই 'ওরিজিন অব স্পিসিজ'। বাজারে সে-বই পড়তে পায়নি। বেরোবার প্রথম দিনই ১,২৫০ কপির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। এর পর বিবর্তন নিয়ে আরও অনেক কাজ হয়েছে। বিশেষ করে, নতুন তথ্য মিলেছে বংশানুক্রম সম্বন্ধে। প্রাকৃতিক নির্বাচন কী নিয়মে ঘটে, তা এসব তথ্য থেকে আরও পরিষ্কার হয়। তার মানে এ নয় যে, মতবাদটাই ভুল। বরং তার উলটো। সত্যিকার তত্ত্ব হল জীবন্ত—তাই দুনিয়ার সব কিছুর মতোই তার পরিবর্তন আর ক্রমবিকাশ হয়। যে মতবাদ মৃত আর অকেজো, একমাত্র তা আগাগোড়া যেমনকার তেমনি থাকে।

ডারউইন আর তাঁর অনুগামী বৈজ্ঞানিকেরা যেসব লক্ষণ দেখে সিদ্ধান্ত করলেন যে, জৈব বস্তুরা একে অন্যের আত্মীয়-কুটুম্ব, এবার একে-একে সেই লক্ষণগুলোর খোঁজ নেওয়া যাক। (ক্রমশ)

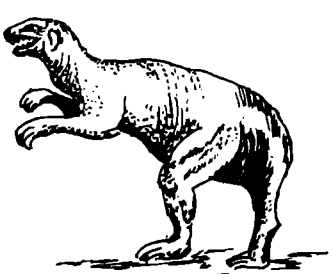

জেনে নাও

কাক কেন শক খায় না ?

ছাদের ওপরে জলের ট্যাঙ্কে জল ভর্তি থাকলে একতলার কল খুললে জল পড়ে। উচ্চতার জন্যে জলের চাপের তফাত হয় আর তাই জল পড়ে। বিদ্যুতের বেলাতেও তাই। তড়িৎচাপের পার্থক্যের জন্যে তড়িৎপ্রবাহ হয়।

ট্রাম লাইনের উপরে যে তার খাটানো আছে, তাতে থাকে উচ্চ তড়িৎচাপ। আর যে লাইনে ট্রাম চলে তার তড়িৎচাপ শূন্য। ট্রামগাড়ির মাথার দণ্ডটি দিয়ে উপরের তারের সঙ্গে লাইনের যোগাযোগ হলে তড়িৎচাপের উচ্চ

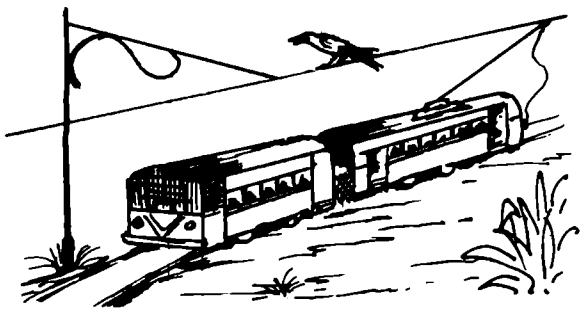

পার্থক্যের জন্যে তড়িৎপ্রবাহ হয় আর তা ট্রামের মোটরকে চালায়।

এই যে তড়িৎচাপের পার্থক্য, আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে তার যোগ ঘটলে বিদ্যুৎপ্রবাহ হয় আর তখন আমরা শক খাই। কাক যখন ট্রামের উপরের তারে বসে, তখন তার সঙ্গে মাটির যোগাযোগ হচ্ছে না। ফলে তড়িৎ চাপের পার্থক্যের দরুন যে তড়িৎপ্রবাহ হয়, মাটির সঙ্গে যোগ নেই বলে কাকের দেহের ভেতর দিয়ে তা চলে না। সেইজন্যে কাক শক খায় না।

রাত্রিতে দেখতে পাই না কেন ?

আমরা দেখি কীভাবে ?

ধরো, আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। তোমাকে আমি দেখছি। দেখছি মানে কী ? আলোকরশ্মি তোমার ওপরে পড়ে আর যেতে পারছে না, ফিরে আসছে। এই ফিরে আসাকে আমরা বলি প্রতিফলিত হওয়া। প্রতিফলিত রশ্মি চোখের লেন্সের ভেতর দিয়ে অক্ষিপটে গিয়ে পড়লে আমার একটা দেখার অনুভূতি হয় আর তার ফলে আমি তোমাকে দেখতে পাই। শুধু তোমাকে নয়, যে-কাউকে। যে-কোনও জিনিসকে দেখাটা এই নিয়মেই হয়।

রাত্রিবেলায় এই আলোর অভাব। ফলে আলো কোনও কিছু থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসার কথাই ওঠে না। আর আলো প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা নেই বলে রাতের বেলায় চোখে আমরা দেখতে পাই না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

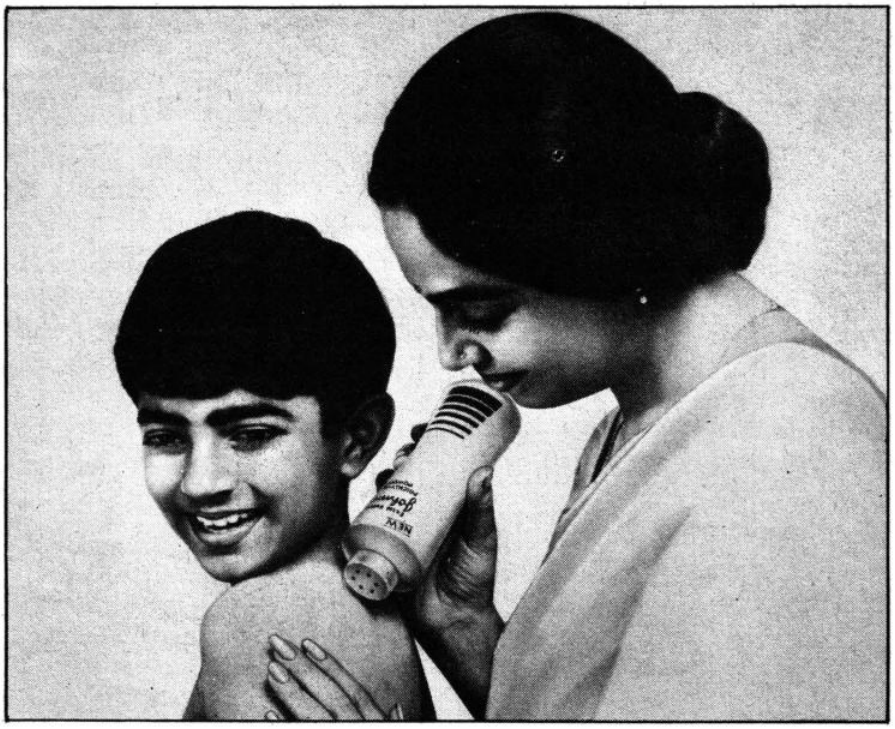

এখন পাবেন!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার

এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে।

ঘামাচিতে আক্রান্ত হবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে সক্ষম?
এখন আরো কার্য্যকরীভাবে আপনি আপনার ঘামাচি সংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার। এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আরো বেশি কার্য্যকরী কেন?
আপনি যখন ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠেন, এবং যখন এই ঘাম আপনার ত্বকে বেশিক্ষণ ধরে থেকে যায়, তখনই আপনি ঘামাচির সম্ভাব্য শিকার হ'তে পারেন। ঠিক এই কারণেই নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এত কার্য্যকরী।

ঘাম ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেবার উপযুক্ত করে বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ত্বকের ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ রোধ করে। তাই আর লালচে র‍্যাশ নয়, নয় কোনো জ্বলুনি বা চুলকানি। সত্যি কী দারুণ আরাম! অধিকন্তু, নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এখন একটি মনমাতানো নতুন সুগন্ধে সমৃদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ঘামাচিতে আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন না, তাড়াতাড়ি নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের একটি প্যাক নিন।
শুধু শুধু ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে পারেন?

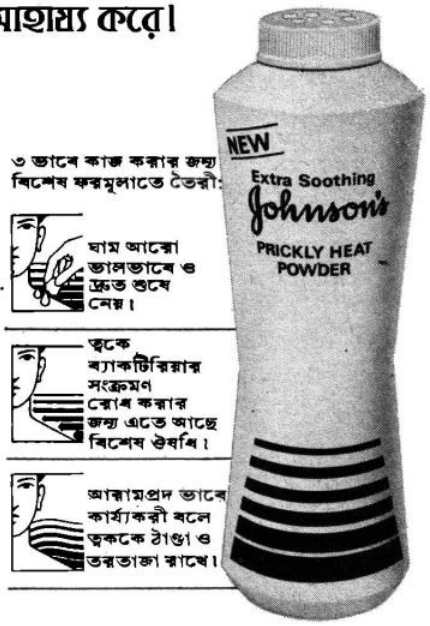

Johnson & Johnson

OBM/4181 BEN

কার গর্জনে মাটি কাঁপে, বাতাস তেতে ওঠে ?

বুরু

সঙ্কর্ষণ রায়

"সর্বনাশ হয়েছে স্যার !"

আমার ঘুম ভাঙল শেরপা দুপকা শেরিংয়ের চিৎকারে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে।

ভুটানে ব্ল্যাক মাউন্টেন পর্বতের নীচে জলার ধারে ক্যাম্প করে আছি আমি ও আমার সহকর্মী অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্ল্যাক মাউন্টেনে কী কী খনিজ আছে খুঁজতে এসেছি আমরা দুজন। আমাদের সঙ্গে আছে শেরপা দুপকা শেরিং। সে আমাদের গাইড।

আমার তাঁবুর বাইরে এসে দেখি যে, অমলও বেরিয়ে এসেছে তার তাঁবু থেকে। আমাদের ক্যাম্পের সামনে জলা। জলার ওপারে ব্ল্যাক মাউন্টেনের উত্তুঙ্গ চড়াই। ব্ল্যাক মাউন্টেনকে ছেয়ে আছে গভীর বন। দিনের আলোয় বনের রঙ নিবিড় সবুজ হলেও সন্ধ্যা হতেই তার রঙ কালো হয়ে ওঠে। তাই পাহাড়ের নাম দেওয়া হয়েছে কালো পাহাড় বা ব্ল্যাক মাউন্টেন। এখন এই সকালে অবশ্য ঝলমলে সবুজ রঙ চোখে পড়ছে। অনেকরকম গাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে। তাদের মধ্যে পাইন গাছেরই প্রাধান্য।

গাছপালা ছেড়ে এখন দুপকা শেরিংকেই দেখছি আমরা। দুপকা উত্তেজিতভাবে বললে, "জলার ধারে আমার ইয়াকটা (চমরি গাই) মরে পড়ে আছে—তার ঘাড়ের কাছে গভীর ক্ষত। মনে হচ্ছে বরফ-চিতার কাজ।"

আমরা এখানে আসার পর পাইনবনের মধ্যে একটা ইয়াক ধরে তাকে পুষেছিল দুপকা। তার শিকারি জন্তুর শিকার হওয়াটা দুপকার পক্ষে খুবই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সে কম্পিত স্বরে বলে চলে, "ওকে মারুন স্যার। আমার পোষা জানোয়ারকে মেরেছে, ওকে আপনারা যতক্ষণ না মারছেন, ততক্ষণ আমি শান্তি পাব না।"

অমল বলল, "তুমি জানলে কী করে যে বরফ-চিতা তোমার ইয়াকটাকে মেরেছে ?"

"আমি নিজের চোখে দেখেছি স্যার," দুপকা জবাব দিল, "ইয়াকটাকে মারতে না দেখলেও আমাদের ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি কাল রাত্রে। বোধহয় ভোরের দিকে ইয়াকটাকে মেরেছে। মেরে, তার ঘাড়ের কাছ থেকে মাংস খুবলে খেয়েছে। মৃতদেহটির বাকি মাংস খেতে আবার আসবে নিশ্চয়ই। হয়তো সন্ধ্যার দিকে আসবে। মৃতদেহের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করলেই তাকে আপনাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেয়ে যাবেন।"

"সে তো পরের কথা। আগে চলো মৃতদেহটাকে দেখে আসি। আপনিও যাবেন নাকি ?" বলে আমার দিকে তাকাল

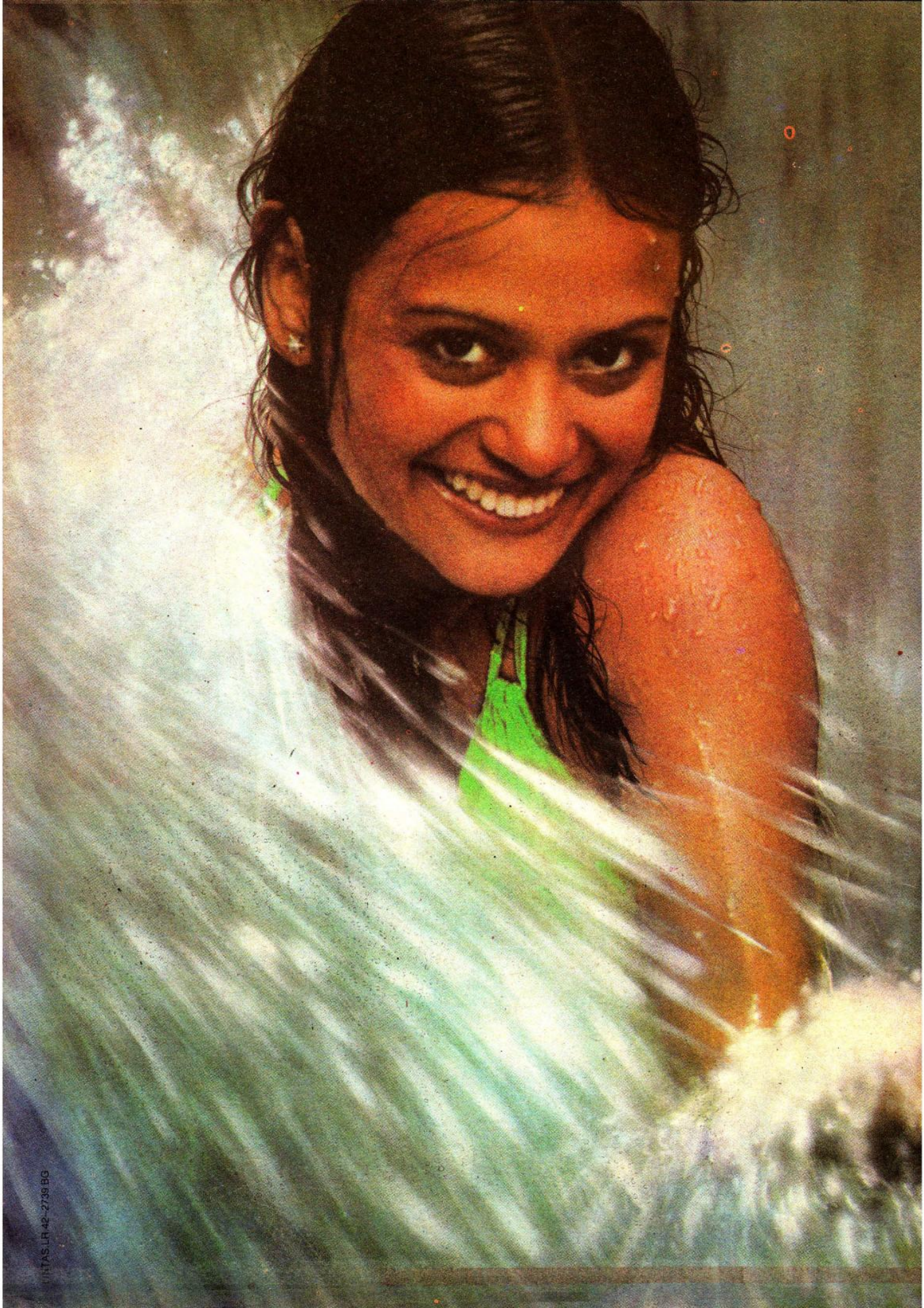

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

লিরিল অনন্য নতুন রূপে!
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে।

নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে ঢলঢল নারীতে!

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

অমল।

"নিশ্চয়ই।" আমি বললাম, "তোমার মতো শিকারি না হলেও শিকারিকে সঙ্গ দিতে আমার ভাল লাগে।"

দুপকাকে অনুসরণ করে অমল ও আমি জলার ধারে একটি পাইনগাছের তলায় রডোডেনড্রনের ঝোপের মধ্যে ইয়াকটির রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পেলাম। চারদিকে রক্তবর্ণ রডোডেনড্রন ফুল ফুটে আছে। ইয়াকটির ঘাড়ের ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোতকেও যেন রডোডেনড্রনের গুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

ইয়াকটির রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অমল বলল, "জানোয়ারটা এই কিল-এর কাছে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। দুপকা, পাশের পাইনগাছের মাথায় মাচান বেঁধে ফেলো, ওখানে বসে অপেক্ষা করব আমরা জানোয়ারটার জন্য।"

জলার পাশে ঘাসবনের মধ্যে কাঠুরেদের তৈরি একটা বাঁশের ঝুপড়ি ছিল, তা থেকে চাটাই তুলে এনে ইয়াকটির মৃতদেহের পাশে পাইনগাছের মাথায় একটি মাচান বেঁধে ফেলল দুপকা। তা ছাড়া একটি মইও তৈরি করে ফেলল গাছের গুঁড়ির গায়ে।

তারপর সন্ধ্যা হতেই অমল, দুপকা ও আমি মই বেয়ে পাইনগাছটির মাথায় মাচানের ওপরে উঠে বসলাম। অমল আমার ও দুপকার মাঝখানে তার রাইফেল বাগিয়ে বসে দুপকাকে বলল, "ইয়াকটার কিল-এর ওপরে ভাল করে আলো ফেলো দুপকা।"

আলো মানে 'স্পট লাইট'-এর আলো। স্পট-লাইট মোটরগাড়ির হেড লাইটের ছোট সংস্করণ। ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সুইচ টিপে তাকে জ্বালানো হয়। সার্চ-লাইটের মতো জোরালো তার আলো। দুপকা থেকে থেকে এই আলো ফেলে ইয়াকের মৃতদেহের ওপরে। বরফ-চিতা যখন মৃতদেহের কাছে আসবে, তখন তাকে বন্দী করে ফেলবে আলোর ফাঁদে। এই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে হিংস্রতম জানোয়ারও চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তারপর তাকে অনায়াসে শিকার করা যেতে পারে।

আমি বললাম, "বরফ-চিতাবাঘ তো বিরল প্রাণী। হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট আছে। যতদূর জানি, বরফ-চিতাবাঘ শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে হাজতবাস অনিবার্য।"

"কিন্তু দুপকা চাইছে যে ওকে আমরা শিকার করি।" অমল বলল, "কী বল দুপকা?"

"আপনারা শিকার না করলে আমিই শিকার করব।" দুপকা গম্ভীর মুখে বলল, "যে জানোয়ার গৃহপালিত পশুর ওপরে হামলা করে, তাকে শিকার করলে কোনও দোষ হয় না।"

আমি বললাম, "দোষ হয় না যদি বনবিভাগের কর্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়।"

"অনুমতি পরে নেওয়া যাবে। জানোয়ারটাকে আগে বাগে এনে শিকার করুন, তারপর আমি থিম্পুতে গিয়ে অনুমতিপত্র নিয়ে আসব। কোনও ভয় নেই হুজুর, করুন শিকার।"

"একটা কথা," অমল বলল, "আর কোনও কথা নয়, চুপচাপ বসে থাকুন। মানুষের গলার স্বর কানে গেলে কোনও বন্য প্রাণী কাছে ঘেঁষবে না। ইয়াকটির মৃতদেহের ওপরে যত লোভ থাক, আমাদের গলার স্বর কানে গেলে চিতাবাঘটি মৃতদেহের ধারেকাছেও আসবে না। কাজেই আমাদের চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হবে।"

অপেক্ষা করতে করতে প্রায় ঘণ্টা-দুই কেটে যায়। থেকে থেকে স্পট-লাইটের আলো ইয়াকটির মৃতদেহের ওপরে নিক্ষেপ করে দুপকা। আলোর বৃত্তের মধ্যে এই মৃতদেহটি ছাড়া আর কিছু নেই। কাছাকাছি কোনও জানোয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে না। শিকার করে রেখে যাওয়া ইয়াকটির কাছে কোনও কারণে ফিরে আসতে চাইছে না চিতাবাঘটি।

সম্ভবত চিতাবাঘটি এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কেন ভয়, কিসের ভয় বুঝতে পারি না আমরা।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমরা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মাচান থেকে নেমে আসার কথা ভাবতে শুরু করেছি, এমন সময় প্রচণ্ড একটা গর্জন সমস্ত বনকে কাঁপিয়ে তোলে। চমকে উঠি আমরা।

"ও, কী ও!" অমল বলল, "বরফ-চিতাবাঘ এমন বিকটভাবে গজরাচ্ছে নাকি?"

অমল প্রশ্নটা করেছিল দুপকার উদ্দেশে। কিন্তু সে কোনও জবাব দেয় না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে তার মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, "অনেকটা বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ। কোন্ জানোয়ারের গলা থেকে এমন আওয়াজ বেরোতে পারে দুপকা?"

আমার প্রশ্নেরও জবাব দেয় না দুপকা। স্পট-লাইটসুদ্ধ তার হাত কাঁপে, সঙ্গে সঙ্গে স্পট-লাইটের আলোও কাঁপে।

অমল বলল, "এ আওয়াজ আর যাই হোক, চিতাবাঘের গর্জন নয়—এমন আওয়াজ—"

অমলের কথা শেষ না হতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় একটি বরফ-চিতাবাঘ। ইয়াকের মৃতদেহের পাশ দিয়ে, রডোডেনড্রনের ঝোপের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে ধেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে।

স্পট-লাইটের আলোয় এক নিমেষের জন্য বরফ-চিতাবাঘটিকে দেখতে পাই আমরা। সাধারণ চিতাবাঘের চেয়ে আকারে একটু ছোট, চামড়ার রঙ হালকা ধূসর ও সাদায় মেশানো। তার এই দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দুর্বার আতঙ্ক প্রকাশ পাচ্ছে। যেন কী একটা ভয়ংকর জানোয়ারের তাড়া খেয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু বরফ-চিতাবাঘ নয়, কয়েকটি ভালুকও পালাল। ভালুকের পেছনে পেছনে পালাল একপাল ইয়াক।

তারপর আরও গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি কেঁপে ওঠে, তেতে ওঠে বাতাস এবং জলার জলের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়।

"ও কী দুপকা?" অমল রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে, "এ কোন্ জানোয়ার, যার তাড়া খেয়ে বাঘ-ভালুক পালায়, যার গর্জনে মাটি কাঁপে, বাতাস তেতে ওঠে, জল তোলপাড় হয়…"

"বুঝতে পারছেন না!" ফিসফিসিয়ে বলে দুপকা, "ভুটানের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শোনেননি এর কথা?"

"না।" হতবুদ্ধির মতো জবাব দিল অমল।

দুপকা বলল, "এ হচ্ছে বুরু। বুরু ডাকছে। জলের মধ্য

দিয়ে আসছে, তাই জলের তোলপাড় হচ্ছে। তার নিশ্বাসে আগুন আছে, তাই হাওয়া তেতে উঠেছে।"

"মাটি কাঁপছে কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"জল ছেড়ে ডাঙায় উঠেছে, তাই মাটি কাঁপছে।" দুপকা জবাব দিল, "আর এক সেকেণ্ড দেরি করা চলবে না হুজুর, প্রাণ বাঁচাতে হলে এখনই চলে যেতে হবে এখান থেকে।"

জলার ধারের ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে সেদিন রাত্রেই আমরা চলে গেলাম ওয়াংদু ফোদ্‌রং নামে শহরটিতে।

বুরুর ভয়ে দুপকা আর ওই জলার ধারে যেতে রাজি না হলেও আবার আমাকে যেতে হয়েছিল ওখানে বুরুর খোঁজ নিতে। বুরুকে খুঁজতে গিয়ে জানলাম যে, অরুণাচল প্রদেশ ও ভুটানের কয়েকটি জলার মধ্যে চার-পাঁচশো বছর আগে প্রায় নব্বই ফুট লম্বা সরীসৃপ জাতীয় দানব বাস করত। সে নড়াচড়া করলেই জলের মধ্যে তোলপাড় হত—তার নিশ্বাসে ছিল গরম ঝোড়ো বাতাসের প্রবাহ। ভুটান ও অরুণাচলের মানুষরা তার নাম দিয়েছিল বুরু। তারা মনে করত যে, বুরু আজও আছে। ব্ল্যাক মাউণ্টেনের নীচে জলার মধ্যে যে বুরু আছে তার প্রমাণ তার তর্জনগর্জন, জলে তোলপাড়, গরম নিশ্বাস এবং মাটিতে কাঁপন ধরা।

সে যে আছে তার আভাস পেলেও তাকে চোখে দেখিনি আমরা, দেখার চেষ্টাও করিনি। এবার ব্ল্যাক মাউণ্টেনের নীচে জলার চারপাশে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চলি। ভাবলাম, খুঁজতে খুঁজতে তার দেখা অবশ্যই পেয়ে যাব।

কিন্তু দেখা পাই না। বুরুর সন্ধান না পেয়ে আমি যখন দুপকাকে বললাম যে, বুরু নেই, তখন তার ভুরুদুটো কুঁচকে ওঠে। সে বলল, "দেখা পান বা না পান, বুরু আছে ও থাকবে। হিমালয়ের সকলেই বিশ্বাস করে সে আছে। সে নেই বললে কেউই মানবে না।"

বুরুকে আমি খুঁজে পাইনি, কাজেই ব্ল্যাক মাউণ্টেনের নীচে জলার মধ্যে তোলপাড়, তর্জন-গর্জন, বরফ-চিতাবাঘ ও অন্যান্য প্রাণীর আতঙ্কের কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। কিন্তু একটা সত্য ব্যাপারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকবে। জলার ধারে মাচানের ওপরে বসে যা যা দেখেছি ও শুনেছি তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা জলা ও পাহাড়ের মধ্যেই থাকা উচিত। কাজেই জলা ও জলার ধারে পাহাড়ের ভেতরে সমীক্ষা চালিয়ে যাই।

সমীক্ষা চালাতে চালাতে জলার উত্তর দিকে পাহাড়ের গায়ে ধসের চিহ্ন দেখতে পাই। এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে বুঝতে পারি যে, সেদিন প্রকাণ্ড একটি ধস পাহাড়ের ওপর থেকে জলার মধ্যে নেমে এসেছিল। ফলে তর্জন-গর্জন, জলের মধ্যে তোলপাড়। এই ধসের দ্রুত পতন বাতাসের মধ্যে এমনি চাপ ও তাপ সৃষ্টি করেছিল যে তপ্ত ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। বরফ-চিতাবাঘ ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর এই প্রলয়ঙ্কর ধসে আতঙ্কিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বুরুর তুলনায় ধস অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তবু বুরুকেই বিশ্বাস করে দুপকা। সে বলে, "ধস অমনি অমনি নামতে পারে না, বুরুই ধস নামিয়েছে সেদিন। বুরুর তাড়া খেয়েই আমরা ব্ল্যাক মাউণ্টেন ছেড়ে পালিয়েছিলাম।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পুতুলের বিয়ে

কমলেন্দু দাক্ষিত

মামনসোনার সাধ জাগল পুতুলরানির বিয়ে
মনের মতন পাত্র পেলে তক্ষুনি দেয় দিয়ে,
সকাল সন্ধে খোঁজ চলেছে পাড়াপড়শির ঘরে,
পুতুলকে তো যায় না দেওয়া যেমন-তেমন বরে।
দোকান বাজার কেনাকাটার সমস্ত কাজ সারা,
কার্ড ছাপানো, নাপিত পুরুত ঠাকুর মাইক ভাড়া।
গোল বাধল একটাও বর জুটল না জুতসই,
কারোর নাসা চ্যাপটা, কারোর চুল অতি অল্পই।
পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে দুঃখে মামন শেষে,
কাণ্ড দেখে বাড়ির লোকে গড়িয়ে পড়ে হেসে।
দাদু বললেন, "পুতুলরানি হয়নি তেমন বড়,
বিয়ের আগে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করো।"
মামনসোনার সঙ্গে পুতুল ইস্কুলেতে যাবে,
পাশ করলেই মনের মতো বর ও খুঁজে পাবে।"

ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতে!

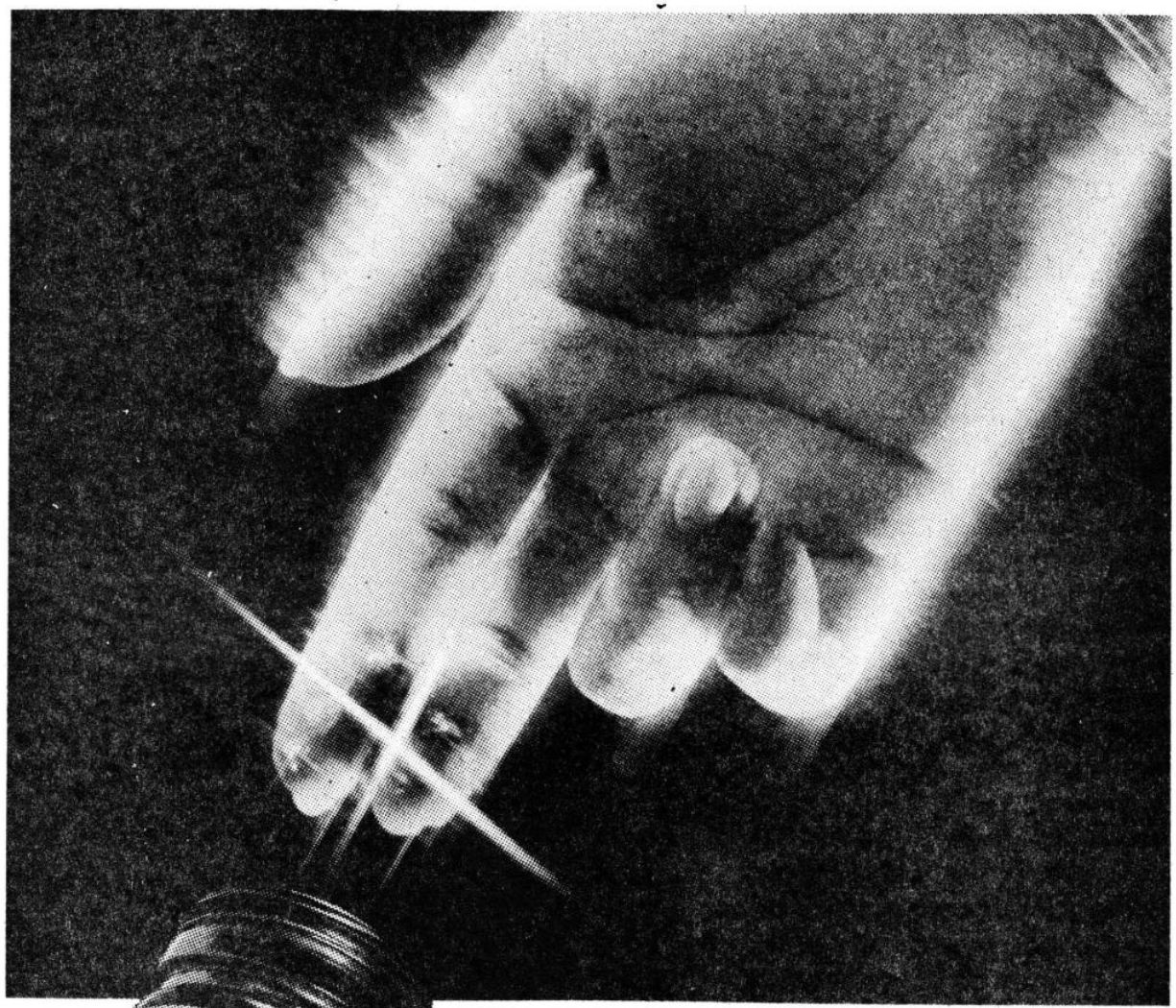

মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা ও দেহের ব্যথা-বেদনার জন্যে!

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের ব্যথা উপশমের শক্তির চমৎকার—আপনার পরিবারজনের দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সব সময়ে হাতের নাগালেই রাখুন। কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে, আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে।

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দু'বার, দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না যাওয়া অব্দি, আয়োডেক্স দিনে দু'বার ... এবং কমার পরেও আরো কয়েক দিন। ব্যথা হ'ল উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ জখম টিস্যু।

সুতরাং, আপনার প্রিয়জন যখনই মচকানির, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবেন, তখনই আপনার হাতের পরশে, আলতো মালিশে লাগান—দিনে দু'বার। আর দেখুন, ওরা কেমন দু'গুণ চটপট সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়।

ELL-1508

SK+F এক এসকেএফ উৎপাদন

আয়োডেক্স® – ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

শুগারবিলির গল্প

সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষের মধ্যে শস্তায় দাঁও মারবার একটা ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে। সমাজে এক শ্রেণীর ঠগ আছে যারা এই ইচ্ছেটাকে ভাঙিয়ে মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে বারবার ঠকিয়ে যায়। টাকা দ্বিগুণ করবার বা লোহাকে সোনা করবার লোভে পড়ে কত লোকের সর্বস্বান্ত হবার কাহিনী আমরা শুনেছি। আবার, ঠকে গেলে অনেকে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার বা লোভের কাহিনী সকলে জানুক এটা চান না ; তাই এরকম অনেক ঠকে যাবার কাহিনী অপ্রকাশিত থেকে যায়। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ হয়তো ছোটখাটো লোভে পড়ে ঠকেছ, তবে তাতে দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই। এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর সব দেশেই সব কালে ঘটে আসছে—তারতম্য শুধু পরিবেশের বা গুরুত্বের। পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গারিতে এরকম একজন ঠগের নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনীগুলির নায়কের নাম শুগারবিলি। তার চেহারা যেমন সপ্রতিভ, তেমনি ঝকঝকে তার কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদও সর্বদা ফিটফাট। এক কথায় তার ব্যক্তিত্ব খুবই আকর্ষক।

প্রথম কাহিনীর যবনিকা যখন উঠল তখন সময় সকাল। স্থান, এক বড় হোটেলের রেস্তোরাঁ। সেখানে হোটেলের অভিজাত বাসিন্দারা তাঁদের প্রাতরাশ সারছেন। এমন সময় শুগারবিলির ঝকঝকে প্রবেশ। চটপটে কথাবার্তা এবং ফিটফাট পোশাক ছাড়াও যে জিনিসটা সকলের চোখে পড়ল, সেটা তার হাতের আংটি। এত বড় এবং এত উজ্জ্বল হিরে সাধারণত চোখে পড়ে না। টেবিলে হাত-মুখ নেড়ে কথাবার্তায় সে এমন ভাব প্রকাশ করছিল যেন এ আংটিটা তার কাছে কিছুই নয়—যেন এমন দামি আংটি তার ডজন-ডজন রয়েছে। সকলের দৃষ্টি শুগারবিলির দিকে।

এক নতুন-হওয়া বড়লোক আর কৌতূহল চাপতে না পেরে শুগারবিলির টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন, অনুমতি নিয়ে পাশে বসলেন। অন্য কথাবার্তার পর অবশ্যই আংটির আলোচনা শুরু হল। ভদ্রলোক শুগারবিলির কাছে আংটিটা ক্রয়ের প্রস্তাব দিতে সে প্রায় আঁতকে উঠল। অনেকবার অনুরোধ করার পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আংটিটা বিক্রি করতে রাজি হল। দাম চাইল পাঁচ হাজার টাকা। তারপর বলল, "এই নিন আংটিটা, কেনবার আগে ভাল করে দাম যাচাই করে নিন।"

ভদ্রলোক আংটিটা নিয়ে ছুটে স্যাকরার দোকানে গেলেন। পরীক্ষা করে স্যাকরা বলল, "এ খাঁটি জিনিস, দাম কম করেও

দশ হাজার টাকা।"

ভদ্রলোক তো আনন্দে আটখানা। দৌড়ে ফিরে এলেন শুগারবিলির কাছে। তবে আর একটু দাঁও মারার লোভে দামটা একটু কমাতে চাইলেন। বললেন, "আংটিটা আমি নেব। তবে দামটা একটু বেশি মনে হচ্ছে, যদি—" কিন্তু শুগারবিলি তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না, রাগত স্বরে বলল, "না, এক পয়সা দাম কমানো যাবে না। এ আংটি আমি বেচব না।" ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে সে আংটিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে পুরল। ভদ্রলোক তো মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন, এমন লাভের জিনিসটা হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। শুগারবিলি অটল। এই ভাবে অনেকক্ষণ চলল। ভদ্রলোক বার বার মাপ চাইতে লাগলেন নিজের ধৃষ্টতার জন্য। অবশেষে বরফ গলল। শুগারবিলি কৃপাপরবশ হয়ে আংটিটা পকেট থেকে বার করে তাকে দিয়ে ধমকের সুরে বলল, "নাও ধরো, এক্ষুনি টাকা নিয়ে এসো।" ভদ্রলোক তো হাতে স্বর্গ পেলেন, ছুটে গিয়ে টাকা নিয়ে এলেন। আংটিটার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন।

দু'দিন বাদে বিচিত্র সংবাদ। ভদ্রলোক স্যাকরার কাছে আংটিটা নিয়ে গেলেন বিক্রির জন্য। পরীক্ষা করে স্যাকরার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "এ তো সে আংটি নয়। এ তো জাল হিরে—এর দাম খুব বেশি হলে দশ টাকা।" ভদ্রলোক তো সেখানেই ধুলোতে বসে পড়েন আর কি। একটু সামলে নিয়ে আরও দু-একজন স্যাকরার কাছে গেলেন—কিন্তু সর্বত্রই এক ফল। ভীষণ হতাশ হলেন তিনি, শুগারবিলির ওপর প্রচণ্ড রাগ হল। রাগ কমলে চিন্তা করে দেখলেন, এখন তো শুগারবিলিকে সহজে ধরা যাবে না ; আর ধরা গেলেই বা কী। সবার সামনেই তো তিনি আংটিটা নিয়েছেন—এখন কেই বা বিশ্বাস করবে তাঁর কথা। সুতরাং মনের সব ক্ষোভ তিনি মনেই জমা করে চেপে গেলেন।

তোমরা প্রায় সবাই জানো, একটু বৃষ্টি হলেই আমাদের কলকাতা শহরের বেশির ভাগ রাস্তায় এখন জল জমে যায়। তেমনি হাঙ্গারির কোনও একটি শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় জল নিষ্কাশনের সমস্যা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় জনসাধারণ অনেক দিন ধরেই এর প্রতিকার চাইছিলেন। একদিন শুগারবিলি মাপজোক করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে হাজির। খুব মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করছে, অন্য কোনওদিকে তার নজর নেই। অবশ্য ইতিমধ্যে পথচারীদের মধ্যে বেশ কৌতূহল জেগেছে। তাদের প্রশ্নের বিনীত জবাব দিয়েছে সে। বলেছে, স্থানীয় জল নিষ্কাশন সমস্যার সমাধানের জন্য একটি প্রকল্প তৈরির কাজেই সে এই মাপজোক করছে। এই নিয়ে গুঞ্জন শুরু হল। কাছের এক বড় দোকানের মালিক কৌতূহল চাপতে না পেরে শুগারবিলিকে তাঁর দোকানে চায়ের আহ্বান জানালেন। শুগারবিলি প্রবল আপত্তি জানাল। কিন্তু কে শোনে সে কথা। মালিক ভদ্রলোক তাকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে চা-টা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সবশেষে কাজের কথা পাড়লেন। অনেক আপত্তি করে সে নিস্পৃহভাবে বলল, "কাজটা এখানকার জলনিষ্কাশন সম্পর্কিত, তবে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" কিন্তু মালিক ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুগারবিলি তাঁকে নক্‌শাটা খুলে দেখাল।

কী আশ্চর্য! প্রস্তাবিত প্রধান নালার লাইনটাই যে দোকানটার অবস্থানের ওপর দিয়ে দেখানো হয়েছে। মালিকের তো চক্ষুস্থির। বুঝি ব্যবসাপত্তর এবার ডকে উঠল। দু-হাত চেপে ধরলেন শুগারবিলির। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "আমাকে বাঁচাতেই হবে, না বাঁচালে যে ছেলেপুলে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে।"

"আরে, করেন কী, করেন কী!" শুগারবিলি মালিকের হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মালিক হটবার পাত্র নন। তিনি এক হাজার টাকা শুগারবিলির পকেটে জোর করে গুঁজে দিয়ে বললেন, "কোনও কথা শুনব না। এটুকু আপনাকে করতেই হবে।"

শুগারবিলি খুব দুঃখিত চেহারা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বার হতেই আর এক দোকাননের মালিক তাকে ধরলেন। একই সমস্যা ; সমাধানও এই রকম। তারপর আর একজন, তারপর আরও অনেকেই একে একে শুগারবিলিকে ডেকে নিয়ে গেল। ফলে দিন-দুয়েকের ভেতর শুগারবিলির বেশ কিছু রোজগার হয়ে গেল—তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। কিছুদিনের ভেতর আসল ব্যাপারটা জানা গেল। যাঁদের গচ্চা গেল তাঁরা আঙুল কামড়ালেন ; কিন্তু পাছে তাঁদের নির্বুদ্ধিতা বাইরে প্রকাশ পায় এই ভয়ে এ-ব্যাপারে আর হৈ-চৈ করলেন না।

শেষ গল্পটি একজন হঠাৎ-বড়লোক-হয়ে-যাওয়া ব্যবসাদার মার্কিন ট্যুরিস্ট সম্পর্কে। ভদ্রলোক প্রচণ্ড বড়লোক এবং খুব শৌখিন। এটা কিনছেন, ওটা কিনছেন, টাকা তাঁর কাছে কোনও সমস্যাই নয়। হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপল একটা ইয়াট নৌকো কিনতে হবে। যে-কোনও দাম দিতে রাজি। শুগারবিলিও ঘটনাচক্রে সেই হোটেলেই উপস্থিত ছিল, সে কথাটা শুনতে পেল। সে তার পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনা করতে লাগল যেন কথাগুলো মার্কিন ভদ্রলোকের কানে যায়। বিষয়বস্তু তার নিজস্ব ইয়াট নৌকো। খুবই লোভনীয় তার বিবরণ।

খানিক বাদে মার্কিন ভদ্রলোক আর থাকতে পারলেন না। যেচে আলাপ করে জানতে চাইলেন নৌকোর সম্পর্কে। বিবরণ শুনে ভদ্রলোক খুবই আগ্রহী হলেন, দাম জানতে

চাইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুগারবিলি জানাল দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। স্থির হল, পরদিন শুগারবিলি তাঁকে নৌকো দেখাতে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অবশ্য শুগারবিলি বন্দরে গিয়ে সব খোঁজখাঁজ নিয়ে এসেছে। সব চেয়ে যে ভাল নৌকো সেটাতে উঠে তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, শুনিয়েছে তার এক আমেরিকান কাকার কথা যার মাথায় সামান্য ছিট আছে। তিনি মাঝে মাঝে মনে করেন তিনি একটা ইয়াট নৌকোর মালিক। সাধারমত এ-ব্যাপারটা দিন-কয়েক থাকে, তারপর তিনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। ক্যাপ্টেন যদি অনুগ্রহ করে আগামী ছ'টা দিন নৌকোয় তার কাকাকে নিয়ে ঘোরেন, তাহলে খুবই উপকৃত হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশ্য এই ছ'টা দিনের জন্য শুগারবিলি ক্যাপ্টেনকে দু-হাজার টাকা দেবে। টাকার অঙ্কটা ছ-দিনের হিসেবে বেশ লোভনীয়। নৌকোর মালিকেরও সম্প্রতি এদিকে আসবার কথা নেই। ক্যাপ্টেন সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলেন। এবার শুগারবিলি ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল যেন নৌকোর মালিকানা কাগজপত্রগুলো একদিনের জন্য ধার দেন। এর জন্য সে কিছু উপরি টাকা দিতেও রাজি হল। একদিনের ব্যাপার, তার ওপর এতগুলো টাকা, সাত-পাঁচ ভেবে ক্যাপ্টেন কাগজপত্রগুলো দিয়ে দিলেন।

ওদিকে রাতেই মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে রইল। সকাল হতে না হতেই দুজনে ছুটলেন বন্দরের উদ্দেশে। ক্যাপ্টেন হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য কর্মচারীরাও সেলাম জানালেন। শুগারবিলি তার মার্কিন কাকাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে ফিরে এল। অবশ্য নামবার আগে সে নৌকোর কাগজপত্রগুলো ক্যাপ্টেনকে দিয়ে যেতে ভুলল না।

মার্কিন ব্যবসাদার তো মহা খুশি। মনের মতো নৌকোয় মহানন্দে ভেসে চলেছেন। এলাহি খানাপিনা চলছে। বলা বাহুল্য এর জন্যও আলাদা করে টাকা দিয়ে গেছে শুগারবিলি। এমনি করে ছ-দিন কেটে গেল। সপ্তম দিন সকালে নৌকো এসে বন্দরে ভিড়ল। মার্কিন ভদ্রলোক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অবাক। রাত্রে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সমুদ্রে নিয়ে যেতে, নৌকো বন্দরে ভিড়ল কেন ?

তিনি তো খাপ্পা হয়ে হম্বিতম্বি শুরু করলেন। অবাক কাণ্ড, ক্যাপ্টেন তার কোনও কথা গায়েই মাখল না, উপরন্তু তাঁকে অনুরোধ করল নৌকো থেকে নেমে যেতে, কারণ ছ-দিন পার হয়ে গেছে। তিনি তো কিছুই বুঝতে পারলেন না। আরও রেগে গেলেন। নিজের নৌকোর ক্যাপ্টেন তাঁকে আদেশ দিচ্ছে নেমে যেতে ! কক্ষনো না। কিন্তু তিনি তো একা, চেঁচামেচিই সার হল। নৌকোর অন্যান্য কর্মচারীরা এসে তাঁকে পাঁজাকোলা করে তীরে নামিয়ে দিয়ে পুলিশে ফোন করল। পুলিশ এসে তাঁকে নিয়ে হাজতে পুরল। পরে অবশ্য তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই, তবে ততদিনে বেশ দেরি হয়ে গেছে। শুগারবিলি তখন বহু দূরে।

আমাদের আশেপাশে শুগারবিলিরা ওত পেতে বসে আছে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য। তাই সকলকে সাবধান করে দিই, লোভ করতে গিয়ে যেন এদের খপ্পরে পোড়ো না।

ছবি : দেবাশিস দেব

রাগ-রাগিণী

রতন সন্যায়মত

রামকেলি আর ভৈরবীতে
ভোরবেলাটা ধন্য,
টোড়ির সঙ্গে ললিত-রাগে
সকালটি অনন্য।
জৌনপুরি, আশাবরী
লয়েও তারা বিদ্যাধরী
দুই বোনেরই দুইটি গতি
চলনটা তাই অন্য।
দুর্গারাগে দুপুর বাজে
মেঘমল্লার ভিন্ন সাজে
সারং এলে মনটা ভেজে
বৃষ্টি ঝরার জন্য।
কল্যাণে আর পূর্বী রাগে
সূর্য রাঙেন অস্তরাগে
শ্রী ছড়িয়ে দূর আকাশে
ইমন রাগের জন্ম।
ভূপালী আর বাগেশ্রীতে
জ্যোৎস্না নামে আচম্বিতে
মধ্যরাতে মন-কাঁদানো
দরবারীটাই গণ্য।
চোখের পাতায় ঘুম নামে, ফের
সে-ঘুম ভাঙে ভৈরবীতে—
আলাপ-জোড়ে দিন কেটে যায়
এই জীবনের গ্রীষ্মে শীতে।

ছবি : দেবাশিস দেব

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে
এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন
মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয়
আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে
গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন
অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

INTAS J&J 23 2619 BG

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল, শিবুবাবুকে সে সূক্ষ্ম পিস্তল দিয়ে তিন-তিনটে কালাসাহেবকে খুন করতে দেখেছে। তাঁর তৈরি আকাশী জামা পরে শূন্যে ঘোরা যেত। শেষ পর্যন্ত তিনি ওলন্দাজের হাতে মারা যান। হরিবাবুর ছোটভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু কালোয়াতি গান করেন। দুজনকেই সে ভূতের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু জরিবাবু যখন বলেন যে, সত্যি তিনি ভূতের ধাক্কা খেয়েছেন, উটকো লোকটা তখন নিজেই যেন ঘাবড়ে যায়। হরিবাবুর দুই ছেলের নাম ঘড়ি ও আংটি। দুর্দান্ত খেলে তারা জেলা স্কুলের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচে বিনোদ হাই-কে জিতিয়ে দিয়েছে। তাদের খেলা দেখে হাতরাশগড়ের মহারাজ মুগ্ধ। নামী কোচের কাছে খেলা শিখবার যাবতীয় খরচা তিনি দেবেন। কিন্তু তাঁর গাড়িতে ক্লোরোফর্মের গন্ধ পেয়ে দুই ভাই সতর্ক। মহারাজকে কারাটে-চপে ঘায়েল করে তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সুযোগ খুঁজছে। তারপর ···

আচমকা একটা মোড়ের কাছে গাড়ির স্পিড কমে গেল। সামনে একটা ছৈ-ওলা গোরুর গাড়ি রাস্তা জুড়ে চলেছে। এই রকম সুযোগ আর আসবে না। ঘড়ি দরজাটা ঠেলল। কিন্তু বজ্র-আঁটুনিতে দরজা এঁটে আছে। ঘড়ি হাতলটা ওপরে নীচে দ্রুত ঘুরিয়ে ঠেলা এবং ধাক্কা দিতে লাগল প্রাণপণে। কপালে একটু ঘামও দেখা দিল তার। কিন্তু দরজা যেমনকে তেমন আঁট হয়ে রইল।

হঠাৎ একটা হাই তোলার শব্দে দুই ভাই-ই চমকে উঠে ডান দিকে তাকিয়ে দেখে মহারাজ নরনারায়ণ সকৌতুকে তাদের দিকে চেয়ে আছেন। আর একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "দরজাটা লক করা আছে। সহজে খুলবে না, খামোখা চেষ্টা করছ।"

দুই ভাই বেকুব হয়ে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকে। মহারাজ নরনারায়ণ লম্বাচওড়া লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু দু-দুটো প্রাণঘাতী ক্যারাটে চপ খেয়েও এত স্বাভাবিক থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

ঘড়ি আর আংটির মুখে কথা সরছে না দেখে মহারাজ নিজেই সদয় হয়ে বললেন, "এত ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। তোমাদের আমার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে একটু আপ্যায়ন করা হবে। তারপর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা যাবে। এখন হাত-পা না ছুঁড়ে চুপ করে বসে থাকলেই আমি খুশি হব।"

ঘড়ি আর আংটি পরস্পরের দিকে একটু তাকাল। আংটির রোখ আছে, জেদিও বটে, কিন্তু সে সবসময় তার দাদাকে মেনে চলে। ঘড়ির গুণ হল, সে চট করে কিছু করে না, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে করে। মহারাজাকে আক্রমণ করাটা হয়তো একটু ভুলই হয়ে থাকবে। ঘড়ি তো জানত না যে, মহারাজা অনেক উঁচুদরের খেলোয়াড়।

বুদ্ধি খেলিয়ে ঘড়ি চট করে স্থির করে ফেলল, আর গা-জোয়ারি দেখিয়ে লাভ নেই। এখন তালে তাল দিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই সে খুব অমায়িকভাবে একটু হেসে হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, "আমরা ভয় পেয়ে ওরকম করে ফেলেছি। আপনার বেশি লাগেনি তো?"

রাজা নরনারায়ণ নিজের গলায় একটু হাত বুলিয়ে বললেন, "আংটি আর তুমি যে দুটো মার বসিয়েছ তাতে যে-কোনও লোকের মরে যাওয়ার কথা। তোমরা দুজনেই সাক্ষাৎ-খুনে।"

আংটি মুখখানা থোতা করে বলল, "কিন্তু আপনি তো মরেননি।"

নরনারায়ণ একটু হেসে বললেন, "রূপকথার গল্পে পড়োনি, সেই যে রাক্ষসের প্রাণভোমরা থাকে জলের তলায় একটা স্তম্ভের মধ্যে সোনার কৌটোয়? আমারও হল সেরকম। সোজাসুজি আমাকে মারা অসম্ভব। তবে যদি কোনওদিন আমার প্রাণভোমরাটাকে খুঁজে পাও তাহলে পুটুস করে আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু কাজটা শক্ত।"

ঘড়ি আর আংটি ফের চোরা চোখে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। ঘড়ি ইঙ্গিতে ভাইকে জানাল, মহারাজার মাথায় গোলমাল আছে।

মহারাজা তাদের দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। পিছনে নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত। বুঝলে? খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।"

ঘড়ি আর আংটি কাঠ হয়ে বসে রইল।

গাড়ি কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, গাড়ির মধ্যে একটু আগে তারা যে ঘুমপাড়ানি ওষুধের গন্ধ পেয়েছিল সেটা মোটেই ঘুমপাড়ানি ওষুধ নয়। তাদের মতো দুর্বল ও অসহায় দুটি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে গুম করার প্রয়োজনই নরনারায়ণের নেই।

তবে গন্ধটা খুব অদ্ভুত। চুপচাপ বসে থেকে ঘড়ি টের পেল এই গন্ধটা শ্বাসের সঙ্গে যতবার ভিতরে যাচ্ছে ততবারই সে যেন বেশ তরতাজা আর ঝরঝরে হয়ে উঠছে। তবে গন্ধটা কিসের তা সে জানে না।

একটু বাদে গাড়িটা একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। সামনের উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, বিশাল বিশাল গাছ। চারদিকটা অন্ধকার-অন্ধকার। রাস্তাটাও বেশ এবড়ো-খেবড়ো। গাড়িটা লাফাচ্ছে, ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতরে প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর গাড়ি ধীরে-ধীরে গতি কমাল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের সিট থেকে ড্রাইভার তড়াক করে নেমে পিছন দিকের দরজা খুলে বশংবদ ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

প্রথমে মহারাজ এবং তাঁর পিছু পিছু ঘড়ি আর আংটি নেমে

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত

ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয়
আর তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তাঁর জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

ব্রণকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের ছাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে ব্রণ হয় বা তা ছড়িয়ে পড়ে, তার এটি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে, ব্রণ শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ড্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3556 BEN

এল। ওদের ভাবখানা নিপাট বাধ্য ছেলের মতো।

জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা একটা জায়গা। কোথাও কোনও প্রাসাদ দূরে থাক, কুঁড়েঘরেরও চিহ্ন নেই। তবে সামনে বড় বড় কোমরসমান ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে ভগ্নস্তূপের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে বটে।

সন্ধে হয়েএসেছে।জঙ্গলের মধ্যে বেশ শীত। ঘড়ি আর আংটি শীতের বাতাসে একটু কেঁপে উঠল। খানিকটা শীতে, খানিকটা ভয়ে।

ঘড়ি আড়চোখে চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল। যে রাস্তা দিয়ে গাড়িটা তাদের এইখানে নিয়ে এসেছে সেটা একটা কাঁচা রাস্তা। রাস্তাটা এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। চারদিককার জঙ্গল তেমন ঘন নয়। ঘড়ি শুনেছে তাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে হাতরাশের জঙ্গল আছে। একটা ছোট নদীও আছে সেখানে। মাঝে-মাঝে শীতকালে ছেলেরা দল বেঁধে চড়ুইভাতি করতে যায়। কেউ কেউ পাখি শিকার করতেও আসে। এটাই সেই জঙ্গল কি না কে জানে, সে কখনও হাতরাশের জঙ্গলে যায়নি।

দেখেশুনে ঘড়ির মনে হল, হঠাৎ যদি তারা দুই ভাই খুব জোরে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায় তা হলে এই নকল রাজা আর তাঁর সুড়ুঙ্গে সেক্রেটারির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এদের মতলব যে ভাল নয় তা এতক্ষণে জলের মতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

মহারাজা গাড়ি থেকে নেমে খুব আলস্যভরে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর ঘুম-ঘুম চোখে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সেক্রেটারি গুনগুন করে কী যেন বলছে। একটু দূরে দাঁড়ানো জড়োসড়ো দুই ভাই কিছু বুঝতে পারছে না।

ঘড়ি আংটির দিকে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল। তারপর আড়চোখে মহারাজ আর তাঁর সেক্রেটারিকে দেখে নিল। না, ওঁরা তাদের লক্ষ করছেন না।

ঘড়ি আর আংটি একটু হাত-পা ঝেড়েঝুড়ে নিল। বড় দৌড়ের আগে ওয়ার্ম-আপ করতে হয়, না হলে পেশীতে টান ধরে। তবে বেশিক্ষণ ওয়ার্ম-আপ করার সময় নেই। দু-একটা লাফ-ঝাঁপ দিয়ে একটু ওঠবোস করে নিয়ে দুই ভাই পরস্পরের দিকে চেয়ে চোখে-চোখে কথা বলে নিল।

তারপর জেলার দুই বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে সামনের ঘাসজঙ্গলে গিয়ে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে ছুটবার হাজারো অসুবিধে। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায় এবং ভয় জিনিসটা মানুষকে অনেক অসাধ্য সাধন করায়।

দুই ভাই ঘাস-জঙ্গলটা প্রায় চোখের পলকে পার হয়ে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে এবং বড় বড় পা ফেলে। ধ্বংসস্তূপটা ডানদিকে, সেদিকে তারা গেল না। বাঁ দিক দিয়ে কোনাকুনি দৌড়ে তারা বড় বড় গাছের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ঘড়ি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রাজা বা সেক্রেটারি কী করছেন। অবাক হয়ে সে দেখল, তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে রাজা আর সেক্রেটারি তখনও কথা বলে যাচ্ছেন।

লোকগুলো কি বোকা? নাকি অতিশয় ধূর্ত? ভাবতে ভাবতে ঘড়ি দৌড়োতে থাকে। পাশাপাশি আংটি।

আংটি জিজ্ঞেস করল, "কী হল রে দাদা? কেউ তো পিছু নিল না?"

"তাই তো ভাবছি।"

"লোকটা কি খুব পাজি?"

"মনে তো হয়।"

"তা হলে আমাদের পালাতে দিল কেন?"

"বুঝতে পারছি না।"

"রাজা তো প্রাসাদের কথা বলছিলেন। সেই প্রাসাদই বা কোথায়?"

"কী করে বলব? তবে দৌড়োতে থাক। এখন পালানোটাই বড় কথা।"

"লোকটার হয়তো কুকুর আছে। লেলিয়ে দেবে।"

"বন্দুকও থাকতে পারে। দৌড়ো।"

দুই ভাই নিঃশব্দে দৌড়োতে থাকে। জঙ্গলটা খুব ঘন নয়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসায় সব কিছু আস্তে-আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে কুয়াশাও উঠছে জমাট বেঁধে। কোথায় যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে না। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিন

রাস্তার উপরে ওগুলি কী ?
মাইন !
সর্বনাশ ! ট্যাঙ্ক এক্ষুনি উড়ে যাবে ! বাঁচাও !
মাইন ফাটল না ? আমাদের ঠকিয়েছে !
বাজে কথা বোলো না ! মাইন হলে ফেটে যেত ! আর হ্যাঁ, আমার সিটের তলায় এক-বস্তা এই জিনিস রয়েছে !
আঁ !
এর নাম থাণ্ডারফ্ল্যাশ ! আগুন লাগলে দারুণ শব্দ করে ফাটে !
সীমান্তে এসে গেছি !
TZHÔL
ওরে বাপ ! এখানেও বেড়া ! সর্বনাশ !
পার হওয়া অসম্ভব ! কী করব এখন ?
বাড়ি ভেঙে বেরিয়ে যাও !
TZHÔL
HÔL
বেঁচে গেছি !
বাপস !
তাহলে এবারে আরাম করে পাইপ ধরানো যাক !
আর-কোনও বিপদের ভয় নেই !
বুম

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দমদম কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

"বয়সের দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের স্কুল একেবারেই নবীন। সবে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বয়সে কী যায় আসে। লেখাপড়াটাই তো আসল কথা," অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বললেন দমদম কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। তারপর বললেন, "কুড়ি বছর আগে যে-আদর্শ নিয়ে আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম, সেই আদর্শ থেকে একটুও সরে আসিনি। লেখাপড়া মানে নিছক লেখা আর পড়া নয়, আরও কিছু। লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে যদি ছেলেমেয়েদের চরিত্রের বিকাশ না হয়, তাদের ভেতরের জড়তা ও দৈন্য যদি না ঘোচে, তাদের মনুষ্যত্ববোধ যদি জাগ্রত না হয়, তাহলে সে-লেখাপড়ার কোনও দামই নেই। আমরা এ-কথা মনে রেখেই এগোবার চেষ্টা করছি।"

প্রধানশিক্ষকের এই কথাগুলো যে নিছক কথার কথা নয়, কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে এটা টের পাওয়া গেল। ১৯৬৫ সালের ১৬ জানুয়ারি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যখন তৈরি হয়, তখন সম্বল ছিল একখানা ঘর আর ন'জন ছাত্র। এখন ছাত্রসংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে গেছে। পি২এ মতিঝিল অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭৪-এ অবস্থিত স্কুলটি এখন শুধু দমদম অঞ্চল নয়, গোটা উত্তর শহরতলির গর্ব।

এই স্কুল থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। কেউ ফেল করে না। গত তিন বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এই রকম : (১৯৮২) পরীক্ষার্থী ৪০। প্রথম বিভাগে ১৭, দ্বিতীয় বিভাগ ২০, তৃতীয় বিভাগ ৩। (১৯৮৩) পরীক্ষার্থী ৪৭। প্রথম বিভাগ ২৭, দ্বিতীয় বিভাগ ২০। (১৯৮৪) পরীক্ষার্থী ৪০। প্রথম বিভাগ ২৬, দ্বিতীয় বিভাগ ১৪। এ-বছর পরীক্ষা দিয়েছে ৫৭ জন ছাত্র। প্রধানশিক্ষক জানালেন, সবাই পাশ করবে।

দমদম কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয় লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তো বটেই, অন্য কয়েকটি কারণেও বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। (১) স্কুলে কোনও ক্লাসের পরীক্ষাতেই ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড বলে কিছু নেই। পরীক্ষায় যারা ভাল নম্বর পায়, তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। যারা ১০০র মধ্যে ৬০ থেকে ৭৫ নম্বর পায় তাদের 'টু স্টার' দেওয়া হয়, আর যারা ৭৬ থেকে ১০০ পায় তাদের দেওয়া হয় 'থ্রি স্টার'। (২) পরীক্ষার হলে কোনও গার্ড থাকেন না। কেউ টোকাটুকি করে না, করলে ধরা পড়ে যায়। (৩) ক্লাসঘরগুলোর নাম মহাপুরুষদের নামে রাখা হয়েছে। যেমন, রামমোহন কক্ষ, বিদ্যাসাগর কক্ষ, রবীন্দ্র কক্ষ, বিবেকানন্দ কক্ষ ইত্যাদি। (৪) স্কুল-লাইব্রেরির দরজা সর্বদা খোলা থাকে। ছাত্ররা ইচ্ছেমতো বই নেয়। কোনও বই খোয়া যায় না। (৫) স্কুলে নিয়মিত শিক্ষামূলক প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীর

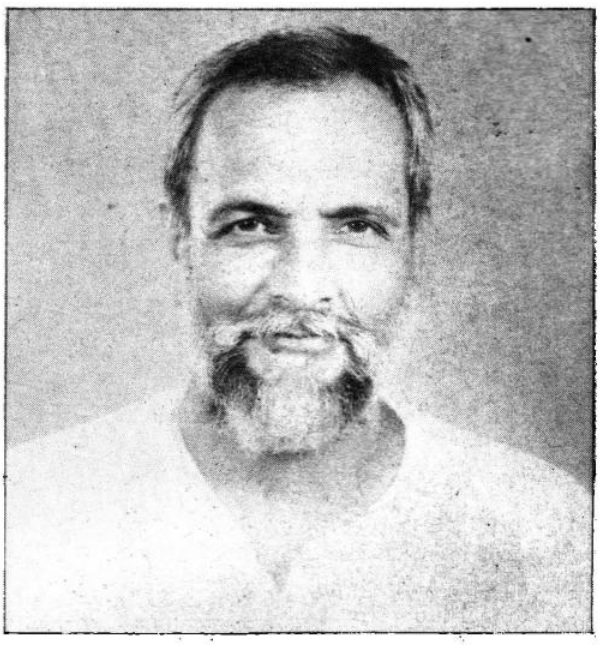

বিষয়-নির্বাচনেও অভিনবত্ব থাকে। এ-পর্যন্ত যে-সব প্রদর্শনী হয়েছে, তা হল : মহাকাশ অভিযান, আধুনিক যুদ্ধ, মানুষের বিবর্তন, কলকাতা, লিপির বিবর্তন, যানবাহন। এ-বছর যে-প্রদর্শনীটি হবে, তার বিষয় মুদ্রা। (৬) স্কুলে প্রতি বছর রক্তদান শিবির হয়। বর্তমান ছাত্ররা এই শিবির পরিচালনা করে। পুরনো ছাত্ররা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। (৭) প্রতি বছর স্কুলের ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেয়। (৮) যে-কোনও ধরনের সেবামূলক কর্মসূচীতে ছাত্ররা দল বেঁধে কাজ করে। (৯) স্কুলে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়। দমদম রোড ও যশোহর রোডের দু' পাশে অধিকাংশ নতুন গাছই এই স্কুলের ছাত্ররা লাগিয়েছে।

শ্রীমিহিরকুমার সেনগুপ্ত প্রথম থেকেই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য, তিনি মনে করেন, শুধু বুদ্ধি নয়, বুদ্ধির সঙ্গে পরিশ্রমও দরকার। ছাত্রছাত্রীদের মাস্টারমশাইরা যেমন পড়া দেবেন, তেমনি পড়া আদায় করেও নিতে হবে। আর মাসে অন্তত দু' বার পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেশি পরীক্ষা নিলেই যে ছেলেমেয়েরা পণ্ডিত হয়ে যাবে, তা নয়। কিন্তু এর ফলে একটু চাপ পড়বে, পড়াশোনার অভ্যেসটাও বাড়বে। যারা সত্যিকারের পড়ুয়া তারা তো বটেই, লেখাপড়ায় যাদের একেবারেই উৎসাহ নেই তারাও বই খুলতে বাধ্য হবে। নোটবই সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্ত খুবই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে এখনকার সব উদ্ভট অর্থহীন অর্থপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের কোনও কল্যাণ করে না।

ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও কর্মশিক্ষা—এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বললেন। জায়গার অভাবে এখানে সব লেখা যাচ্ছে না। আলোচনার প্রধান কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি : ইংরেজি ও বাংলা দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফাঁকি দিয়ে এই দুটি বিষয়ে কিছুতেই ভাল নম্বর তোলা যায় না। পাঠ্যবই ছাড়াও সহায়ক-বই পড়তে হবে। **সহায়ক-বই বা রেফারেন্স বুক নির্বাচনের সময় কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। বিস্তর জাল-বইয়ে বাজার ছেয়ে আছে।** এ-ব্যাপারে মাস্টারমশাই বা অভিজ্ঞ লোকজনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ইংরেজি বাংলা—দুই ভাষাতেই জটিল বানানের ছড়াছড়ি। এইসব বানানের দিকে নজর রাখতে হবে। আর একটা মস্ত ব্যাপার, হাতের লেখা। হাতের লেখা যে মুক্তোর মতো হতেই হবে, তা নয়, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ভাল হাতের লেখা দেখলে পরীক্ষকরাও ভারী খুশি হন। **সাহিত্য অংশের সঙ্গে ব্যাকরণ অংশও পড়তে হবে, যথেষ্ট যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে।**

ইতিহাস- এবং ভূগোল এই দুটো বিষয়ই খুব ভাল। ইতিহাস তো প্রবাহের মতো। অতি জীবন্ত বিষয়। একটু মন দিয়ে পড়লেই একেবারে মগজে গেঁথে যায়। দরকারমতো মুখস্থও করতে হবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু যা লিখতে বলা হয়েছে, লিখতে পারলে ভাল নম্বর উঠবে।

ভূগোলের ব্যাপারেও এই একই কথা। কাঁড়ি কাঁড়ি লিখতে হয় না, কিন্তু ভাল নম্বর ওঠে। ভূগোলের জন্য ম্যাপ এবং ছবি আঁকা অভ্যাস করতে হবে। ম্যাপ এঁকে যদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, নম্বর তো ভাল ওঠেই, উত্তরদাতার অনুশীলন ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে পরীক্ষকও খুশি হন। ভূগোল পড়ানোর সময় ক্লাসঘরে ডায়াগ্রাম, চার্ট, মডেল, ম্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে একটি জীবন্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে, যাতে পুরো ব্যাপারটা ছেলেমেয়েদের কাছে সহজ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান যিনি পড়াবেন, তাঁকেও এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞান একটু খটোমটো বিষয়, বিজ্ঞান পড়ানোর সময় এই ধারণা পালটে দিতে হবে। বিজ্ঞানের যে-অংশ পড়ানো হচ্ছে, দরকার হলে ছবি এঁকে কিংবা মডেলের সাহায্য নিয়ে সেই অংশটিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অঙ্ক মুখস্থ করারও প্রবণতা আছে অনেকের মধ্যে, এটা কিন্তু একেবারেই খারাপ অভ্যাস। অঙ্ক বুঝতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই ভাল নম্বর উঠবে।

কথায় কথায় প্রধানশিক্ষক জানালেন, 'আনন্দমেলা' কাগজটিকে তিনি বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন। ৬৬ পাতার এই কাগজটিতে বিস্তর শেখবার জিনিস আছে। ভালবাসবার মতো জিনিস আছে। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে!

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর তিন-তারকা ছাত্র

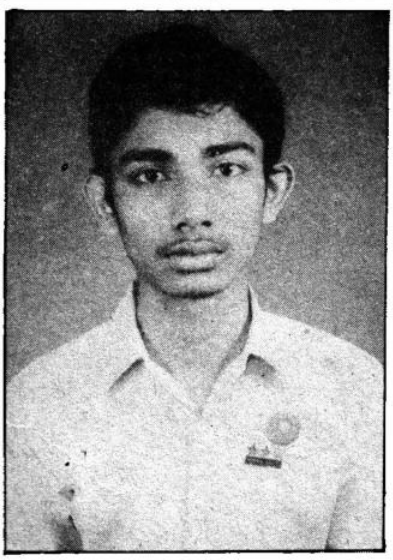

দমদম কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনটে স্টার পেয়ে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ উঠেছে অমিতাভ মিত্র। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে অমিতাভ পেয়েছে ৬৯০। সহপাঠী-বন্ধু শমী গুপ্ত ও কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরীক্ষার ব্যাপারে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় অমিতাভর।

অমিতাভ থাকে নাগেরবাজারে। অমিতাভর বাবা শ্রীশ্যামসুন্দর মিত্র, মা শ্রীমতী যূথিকা মিত্র। কোনও গৃহশিক্ষক নেই অমিতাভর। কারণ জিজ্ঞেস করায় অমিতাভ জানাল, "গৃহশিক্ষকের কী দরকার? মাস্টারমশাইরা এত ভাল বুঝিয়ে দেন যে, আলাদা করে গৃহশিক্ষক রাখবার দরকারই হয় না।" দিদি সঞ্চিতা মিত্র মাঝে-মাঝে অঙ্ক দেখিয়ে দেন।

সকাল ৫টায় ঘুম থেকে ওঠে অমিতাভ। হাত-মুখ ধুয়েই পড়তে বসে যায়। সকাল-সন্ধ্যায় ৫-৬ ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিনে বিশেষ পড়াশুনো হয় না। বিদেশী গল্প-কবিতার অনুবাদ করে সময় কাটে। অমিতাভর প্রিয় বিষয় বাংলা।

অমিতাভ কবিতা লেখে। অনেক কাগজে ওর কবিতা ছাপা হয়েছে। এবার বইমেলায় গিয়ে অমিতাভ তিনটে কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের বই কিনেছে। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভর প্রিয় কবি। এঁদের বিস্তর কবিতা অমিতাভর মুখস্থ। কয়েকজন লেখকের গল্প উপন্যাসও অমিতাভ খুব পছন্দ করে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং বুদ্ধদেব গুহর বই হাতে পেলে পড়তে ভোলে না।

অমিতাভ পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য ক্লাসের বই ছাড়াও অন্যান্য বই পড়ে। বাংলায় খুব বেশি বই পড়বার দরকার হয় না। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইটি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায়। ইংরেজিতেও দুটি বই ওকে খুব সহায়তা করে। একটি পি· কে· দে-সরকারের বই, অন্যটি পি মাহাতোর। ইতিহাসে একেবারে হালের দু'জন লেখকের বইয়ের সঙ্গে বিনয় ঘোষের একটি পুরনো বই পড়ে। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে অমিতাভ নিয়েছে পদার্থবিদ্যা। এই বিষয়টির জন্য অমিতাভ পড়ে অসিত দাস আর চক্রবর্তী-চক্রবর্তীর বই।

অমিতাভর বাবা-মা'র খুব ইচ্ছে, অমিতাভ ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুক। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হোক। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে অমিতাভর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ও চায় মনেপ্রাণে একজন লেখক হতে। বড় লেখক। রুশ লেখক দস্তয়ভস্কি অমিতাভর আদর্শ।

'আনন্দমেলা' অমিতাভর প্রিয় পত্রিকা। এই পত্রিকার গল্প, ছড়া আর ধারাবাহিক উপন্যাস খুব ভাল লাগে। তবে ছড়া নিয়ে ওর সামান্য আপত্তি আছে। নতুন লেখকরাও এখন বড় পুরনো আর একঘেয়ে বিষয় নিয়ে ছড়া লেখেন। "একটু নতুন মেজাজ আর আলাদা স্বাদের ছড়া চাই। কেন সে-রকম ছড়া কেউ লিখছেন না?"

রোভার্সের রয়

রোভার্সের খেলোয়াড়দের আড়াল থেকে কে বিপদে ফেলতে চাইছে ?

জেরি হলোয়ের পা হড়কে গেল…
উঃ !
কী হল জেরি ?
ভাঙা বোতলে পা পড়েছিল !
বিচ্ছিরিভাবে কেটেছে !
কারা যে জঞ্জাল ফেলে যায় !
জেরির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল…
হোটেলে ফেরা যাক
কে যে পাথর ফেলল !
বুনো ছাগলের পায়ের ঠোক্করে পাথর পড়েছে !
এক ঘণ্টা বাদে…হোটেলে…
সেলাই করতে হবে। খেলা সম্ভব নয়।
অ্যাঁ ?
ভেবো না, নতুন কাউকে নামাব।
রয় লাউঞ্জে এসেছে…
স্টেভ, অত আইসক্রিম গিলো না !
কাল তোমাকে মাঠে নামাব।
অ্যাঁ ?
ভালই তো !
স্ট্যামব্রিজ সিটি বনাম রোভার্স। মাঠ একেবারে ভর্তি।
একটাও সিট খালি নেই !
হুম্। সবাই যথাসাধ্য খেলে যাও।
স্ট্যামব্রিজ মাঠে নামছে…
মনে রেখো, ওরা দ্বিতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ান !
আমাদের হারাতে চায় !
জেরির জখমের কথা স্ট্যামব্রিজ শুনেছে…
স্টেভ নেলর নেমেছে !
নতুন খেলোয়াড় !
ওর ওপর চাপ রাখব !
খেলা শুরু হল…
স্টেভ ভুল-ট্যাকল করল !
উঃ !
পেনাল্টি !
স্ট্যামব্রিজ সিটি কি রোভার্সকে হারিয়ে দেবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন— চা বা কফি, দই বা মিঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

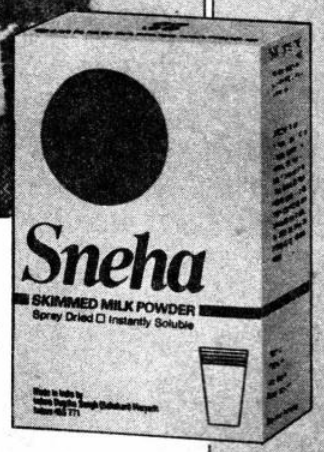

স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!

মধ্য প্রদেশ ক্ষুদ্র বহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে সেই গ্রামে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে এসে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল। তারপর দিপুও আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে গেল থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে এলেন শ্মশানের এক সাধুবাবার কাছে। এদিকে কলকাতায় দিপুর বাবা ওদের খবর না পেয়ে ছটফট করছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর এক ডাক্তারবন্ধু ও এক পুলিশসাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, খুঁজতে-খুঁজতে চলে এলেন সেই শ্মশানধারে। তারপর···

দিপু ইরানির সঙ্গে কথা বলছিল, হঠাৎ চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল, ইরানিকে আর সে দেখতে পেল না। অথচ দিপুর মনে হল, ইরানি তার কাছেই আছে, মাঝখানে কিছু একটা আড়াল পড়ে গেছে। দিপু হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তার হাতে কিছুই ঠেকল না। এক্ষুনি দিনের আলো ঝলমল করছিল, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কী করে ?

দিপু ডাকল, "দিদি, এই দিদি !"

কোনও উত্তর এল না। তা হলে কি ইরানি তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দিপু ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "কী হল ? এই জায়গাটা অন্ধকার করে দিল কে ?"

অমনি দুলতে লাগল অন্ধকারটা। জলের ঝাপটার মতন কেউ যেন সেখানে আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তারপর সেই অন্ধকারটা একটা পর্দার মতন হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে চলে গেল।

এবারে দিপু দেখতে পেল একটু দূরে ডমরুজি একটা ছোট আমগাছের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন।

দিপু গলা তুলে বললেন, "এই যে, শুনছেন ! ডমরুজি, আমি দিদির সঙ্গে কথা বলছিলুম, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কী করে ?"

ডমরুজি মুখ ফিরিয়ে দিপুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর কী যেন বললেন, দিপু কিছুই শুনতে পেল না। ডমরুজির মুখ নড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কী বলছেন ?"

অমনি ডমরুজি অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেখান থেকে। হাওয়ায় গাছটা দুলতে লাগল, ঠিক যেন মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে চাইছে। তারপর আস্তে-আস্তে গাছটাই হয়ে গেল ডমরুজি। তিনি একটা সবুজ আলখাল্লা পরে আছেন, তাঁর মাথার দু'পাশ দিয়ে ডালপালা বেরিয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় ডমরুজি এগিয়ে আসতে লাগলেন তার দিকে।

দিপু বলল, "এ কী, আপনি এরকম অদ্ভুত ভাবে সেজেছেন কেন ?"

ডমরুজি বললেন, "আমি তো কিছু সাজিনি, তুমিই আমাকে সাজিয়েছ।"

"তার মানে ?"

"তোমার ঘুম ভাল করে ভাঙেনি, তুমি এখনও স্বপ্ন দেখছ !"

"আমি যে দিদির সঙ্গে কথা বলছিলুম ?"

"তুমি তোমার দিদি ইরানির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে। সেই স্বপ্নের মধ্যে দু'জনে কথা বলছিলে। কিন্তু ইরানির যে ঘুম ভেঙে গেল। এখন তো আর তুমি ওকে দেখতে পাবে না।"

"মনে হচ্ছিল দিদি যেন একদম আমার সামনে বসে আছে।"

"আসলে তোমার দিদি শুয়ে আছে শ্মশানের ধারে এক সাধুর ঘরের মধ্যে।"

"আমি সেখানে যেতে পারি না ? দিদির খুব মনখারাপ।"

ডমরুজি মুখ নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মুখখানা হালকা নীল রঙের হয়ে গেল। দিপু আগেও লক্ষ করেছে, ডমরুজির মনখারাপ হলেই মুখের রং বদলে যায়।

ডমরুজি আস্তে-আস্তে বললেন, "হ্যাঁ, এবার তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত। তোমার বাবা তোমাকে খুঁজতে এসেছেন। শোনো দিপু, তুমি কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই এখানে এসেছিলে, আমি তোমাকে জোর করে আনিনি।"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, আমি তো ইচ্ছে করেই এসেছি। কিন্তু— "

"এবার তোমাকে ফিরতে হবে। আমি সে ব্যবস্থা এক্ষুনি করে দিতে পারি। তবে, তুমি কি একা ফিরতে চাও, না তোমার জ্যাঠামশাইকেও সঙ্গে নেবে ?"

"জ্যাঠামশাইকে তো নিতেই হবে। তাঁকে খুঁজতেই তো এসেছি !"

"তোমার পক্ষে ফেরা সোজা ! কিন্তু তোমার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে একটু মুশকিল হবে। উনি যে ফিরতে চান না। তুমি ওঁকে বোঝাতে পারবে ?"

"হ্যাঁ পারব। জ্যাঠামশাই কোথায় ?"

"আমি তোমার স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছি। এবারে তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে খুঁজে নাও। আমি তোমার পাশে থাকব না, তা হলে অসুবিধে হবে। তোমরা ফিরে যাবে, আমার আর কোনওদিন ফেরা হবে কি না কে জানে ! বিদায় দিপু !"

তারপরই ডমরুজির চেহারাটা মিলিয়ে গেল, একটু দূরে দেখা গেল ছোট আমগাছটাকে, সেটা আবার ঝাতাসে দুলছে।

মাথার ওপরে একটা প্লেনের শব্দ শোনা গেল।

এবারে দিপু বুঝতে পারল, সত্যিই সে জেগে উঠেছে। সে শুয়ে আছে আমবাগানে। গায়ে খুব চড়া রোদ লাগছে। কাছে, দূরে অনেক রকম শব্দ। স্বপ্নের মধ্যে এত শব্দ শোনা যায় না।

সব কিছুই নরম-নরম মনে হয়।

দিপুর দারুণ খিদে পেয়ে গেল। ডমরুজির সঙ্গে সে কতদিন ধরে ঘুরছে কে জানে! এর মধ্যে তো সে কিছুই খায়নি।

খিদের চোটেই দিপু উঠে পড়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। এই আমবাগানটা আগে সে ভাল করে লক্ষই করেনি। মাঝে-মাঝে স্বপ্ন ভেঙে অস্পষ্ট একটু দেখেছে। এখন সে দেখতে পেল যে, বাগানটা বেশ অনেকখানি বড়, একদিকে একটা ভাঙা বাড়ি। তার পাশে একটা পুকুর। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় এ বাড়িতে কোনও মানুষজন থাকে না।

দু' একটা কাঁচা আম পড়ে আছে মাটিতে। দিপু সেগুলোই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগল। দারুণ টক।

জ্যাঠামশাই গেলেন কোথায়? ডমরুজি বলে গেলেন জ্যাঠামশাইকে খুঁজে নিতে। স্বপ্নের মধ্যে জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাওয়া খুব সহজ ছিল। এখন দিপুকে খুঁজতে হবে। আচ্ছা, জ্যাঠামশাই তো এখানে আরও আগে থেকে রয়েছেন, তাঁর খিদে পায় না?

খুঁজতে খুঁজতে দিপু দেখল, পুকুরের ধারে একটা ছোট ঘর। আগেকার দিনে বোধহয় সেটা স্নান করে উঠে জামা-কাপড় ছাড়ার ঘর ছিল। সেই ঘরের মেঝেতে একটা খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন জ্যাঠামশাই। তাঁর মুখে ছ'সাত দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, তিনি চোখ বুজে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসি।

দিপু আগে জ্যাঠামশাইকে যখন দেখেছে তখন তাঁর মুখে দাড়ি ছিল না। স্বপ্নে তা হলে চেহারাটাও বদলে যায়?

সে আস্তে গায়ে হাত রেখে ডাকল, "জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই!"

দু'তিনবার ডাকেও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন দিপু বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিল।

জ্যাঠামশাই এবারে বিরক্ত ভাবে চোখ মেলে বললেন, "কে? এই, তুই কে রে? ও, কেষ্ট, তাই না? আমার ঘুম ভাঙালি কেন রে?"

দিপু বলল, "আমি কেষ্ট নই। জ্যাঠামশাই, আমি দিপু!"

জ্যাঠামশাই চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখলেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, "দিপু? তুই এখানে এলি কী করে? এখানকার সন্ধান তো কেউ জানে না?"

"জ্যাঠামশাই, একটু আগেই তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, মনে নেই? সেই যে একটা নদীর ধারে—"

"ইস, তুই আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি? কী চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলুম জানিস? কাকে দেখছিলুম বল্ তো? ইরানিকে! আমি ইরানির স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম! খুব সুবিধে হয়েছিল, আমি ওকে আমার খবর সব বলে দিচ্ছিলুম, ও তোর বাবাকে জানিয়ে দিত!"

"আমার সঙ্গেও দিদির দেখা হয়েছিল। আমি দিদিকে বলে দিয়েছি, আমরা এই আমবাগানে আছি! চলুন জ্যাঠামশাই, সময় হয়ে গেছে, আমাদের এবারে ফিরে যেতে হবে।"

"অ্যাঁ? তুই বলিস কী? ফিরে যাব? কোন্ দুঃখে? এখানে চমৎকার আছি। কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই, শুধু শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখা। কত সুন্দর জিনিস যে দেখলুম!"

"জ্যাঠামশাই, জানেন কি, বাবা পর্যন্ত আমাদের খোঁজে এখানে চলে এসেছেন। আপনি এখানে কতদিন শুয়ে থাকবেন?"

"তুই এক কাজ কর, দিপু! তুই চলে যা! তোর পড়াশুনো আছে, তোর মা চিন্তা করবে, তুই এখানে বসে আছিস কেন? যা, দৌড়ে চলে যা! কী করে যাবি জানিস তো? এই আমবাগানটা পার হলেই দেখবি একটা খাল। সেই খালের ধার দিয়ে সোজা হেঁটে যাবি। তারপর এক সময়ে দেখবি সেই খালটা একটা নদীতে মিশেছে। তখন নদীর ডানপাশ ধরে আর খানিকটা গেলেই শ্মশান দেখতে পাবি। সেখান থেকে আমার বাগান তো কাছেই!"

"জ্যাঠামশাই, আপনাকে না নিয়ে আমি যাব না!"

"দূর পাগল, আমার সঙ্গে তোর ফেরার কী সম্পর্ক! তুই তো আমাকে দেখেই গেলি, ফিরে গিয়ে সবাইকে বলবি, আমি ভাল আছি!"

"না, আপনি চলুন!"

দিপু জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরতেই তিনি বেশ রেগে গেলেন। চোখ কটমট করে বললেন, "ওরকম অসভ্যতা করে না দিপু! হাত ছাড়! আমি যাব না, তুই ফিরে যা বলছি!"

দিপু বলল, "আমি তো এই আমবাগানটা চিনেই গেলাম। এখানে যদি বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "এলেও আর আমাকে খুঁজে পাবি না। এখন বিরক্ত করিস না তো। আমাকে একটু ঘুমোতে দে।"

"জ্যাঠামশাই, আপনার খিদে পায় না?"

"চুপ্, এখানে খিদের কথা উচ্চারণ করতে নেই।"

জ্যাঠামশাই আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজে গেল।

দিপু বুঝতে পারল না সে এখন কী করবে। ইরানির সঙ্গে স্বপ্নে দেখা হয়ে যাবার পর তার মনটা খারাপ লাগছে। এখানে আর একটুও থাকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু জ্যাঠামশাই এরকম জেদ করলে তো মুশকিল। সে তো আর জ্যাঠামশাইকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারে না।

ডমরুজির সঙ্গে আর একবার দেখা হলে ভাল হত। কিন্তু ডমরুজি যে বললেন 'বিদায় দিপু', তার মানে ওঁর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না? উনি নিজে ইচ্ছে না করলে তো ওঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও উপায় নেই!

জ্যাঠামশাই এর মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। যেন কোনও ব্যথায় উঃ করছেন। এখন তাঁর ঠোঁটে হাসি নেই। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "না, ডমরুনাথ, আমি যাব না। তুমি কেন আমায় ভয় দেখাচ্ছ? আমি পারব, সহ্য করতে পারব। উঃ, উঃ!"

জ্যাঠামশাই চোখ মেলে দিপুর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে একটা ভয়ের ছাপ। এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর তিনি বললেন, "ও, দিপু, তুই কী সর্বনাশ করলি আমার। তুই খিদের কথা বললি। আর আমি অমনি শুধু খিদের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। চতুর্দিকে কত মানুষ খেতে পাচ্ছে না! ডমরুনাথকে ডেকে বললুম, আমাকে অন্য স্বপ্ন দাও! সে বলল, তোমাকে ফিরে যেতে হবে। নইলে এখন থেকে এই স্বপ্নই দেখবে। সব স্বপ্নই তো সুন্দর নয়! ওরে

দিপু, খিদেয় যে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

দিপু বলল, "কাঁচা আম খাবেন ?"

"কাঁচা আম ? তাতে যে আমার দাঁত টকে যাবে। তবু দে, তাই দে ! থাকতে পারছি না।"

"তা হলে এ ঘর থেকে বেরিয়ে চলুন। বাগানে আম আছে।"

জ্যাঠামশাই প্রায় দৌড়েই চলে এলেন বাগানে। নিজেই একটা আম কুড়িয়ে নিয়ে কামড় বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "উ হু হু হু, বড্ড টক। বুড়োমানুষে এ জিনিস খেতে পারে ?"

দিপু বলল, "তা হলে ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "তা হলে আর কী হবে ? চল, তাহলে ফিরেই যাই। আর খিদে সহ্য করতে পারছি না। গরম ভাত খেতে ইচ্ছে করছে, আর একটু ঘি আর আলুসেদ্ধ। তোর ইচ্ছে করছে না ?"

দিপু বলল, "খুব !"

জ্যাঠামশাই দিপুর হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। আমবাগানটা পার হয়ে আসার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার স্বপ্ন কি একেবারেই ভেঙে গেল, আর ডমরুনাথকে দেখতে পাব না ?"

দিপু বলল, "রোজ রাত্তিরে ঘুমিয়েই তো আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন ওঁকে দেখতে পাব না ?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না রে ! সে স্বপ্ন তো আলাদা। ডমরুনাথ আমাকে আর তোকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে এসেছিল। কষ্ট হচ্ছে রে যেতে, এদিকে খিদের কষ্টও সহ্য হচ্ছে না।"

দিপু দেখল, কাছেই একটা আমগাছের ডগা খুব বেশি নড়ছে। অন্য গাছগুলো শান্ত। ওই গাছটা ওরকম করছে কেন, ওখানে কি ডমরুজি আছেন ? কী জানি !

ওরা খালপাড় ধরে হাঁটতে লাগল জোরে জোরে। খিদের টানই ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে দূরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কয়েকজন লোক ছুটে আসছে। সবার আগে দেখা গেল ইরানিকে।

কী করে ইরানি এই রাস্তাটা চিনতে পারল ?

সে কথা চিন্তা করার আর সময় হল না, দূর থেকেই ইরানি ডেকে উঠল, "দিপু— ।" সেও উত্তর দিল, "দিদি, আমরা এসে পড়েছি !"

দিপুর বুকটা ধকধক করছে। হঠাৎ সাংঘাতিক একটা উত্তেজনা বোধ করছে সে। আকাশে ঘনিয়ে এসেছে মেঘ। জোর হাওয়া উঠল, বজ্রপাতের শব্দ হল। তার মানে ডমরুজি কাছেই আছেন। তিনি নামবার চেষ্টা করছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন ওদের সবাইকে।

দিপু আকাশের দিকে তাকাল। সে ডমরুজিকে দেখতে পেল না।

আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না ? (সমাপ্ত)

ছবি : অনুপ রায়

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

সমরেশ মজুমদারের

শয়তানের চোখ

জমজমাট এই রহস্য-উপন্যাস একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই পড়তে থাকো

সহজে ইংরেজি

কবিতা লেখা কি সহজ ?

পাড়ার ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক, এইসব নিয়ে একটা জলসার আয়োজন করেছিল। চামেলিরা একটু আগে সেখান থেকে ফিরেছে।

We find them talking about the evening's programme of songs and dances, play and poetry-reading.

Chambal asks a question that we often hear. In fact, it's a question that occurs to almost everybody, sooner or later.

"Mummy," he says, "how many songs did Rabindranath compose?"

"A great many," says Mrs Roy. "Milly will tell us how many. She's getting to be an expert in that field. Come on, Milly."

Chameli gravely says, "Three thousand."

"Or thereabout," Mrs Roy adds. Chambal sounds surprised, "As many as that? He must have been a very hard-working man."

Chameli again speaks gravely. "Our Bengali teacher said the other day, we had to work very hard if we wanted to get anywhere in life."

Mr Roy then says, "When we were boys we used to think the Poet had a very easy life. We thought being a poet meant knowing no care and hardship. How wrong we were!"

তখন চম্বলের একটা কথা মনে পড়ল।

"Daddy," he said, "there's a boy in my class who writes poetry. I asked him how he did it. He said it was quite easy. But when I tried to write a poem for the school magazine I didn't find it easy at all."

Mr Roy said, "I suppose it can be easy for one who has a knack for it. You have to have a way with words. Not everybody has it. You and I are the unlucky ones, I'm afraid."

আগের বার বলেছি, ইংরেজির রীতি-নীতি ধরন-ধারণ আমাদের বাংলার থেকে অন্য রকম। তার একটা উদাহরণ এবার লক্ষ করো।

আমরা বাংলায় বলি :

আমি ভেবেছিলাম তুমি আমায় ভালবাসো।

কিন্তু ইংরেজিতে

I thought you loved me.

খেয়াল রাখো, ওই ইংরেজি বাক্যেও এখনকার ভালবাসার কথাই হচ্ছে, আগেকার নয়।

তেমনি :

Our Bengali teacher said, we had to work very hard

আসলে তিনি বলেছিলেন :

You have to work very hard.

তেমনি আবার :

He said it was quite easy.

আসলে সেই ছেলেটি কী কথাটা বলেছিল, বলো তো।

প্রসাদ

অর্থ জানো

মৌলী ... ফৌত

লক্ষ করে দ্যাখো, নীচের শব্দগুলি বিপুলকায় নয়, খুবই ছোট। তবু 'ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে।' এরা ছোট, কিন্তু যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি জোরালো। তাই সাহিত্যে এদের প্রচণ্ড দাবি। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **হক**— (ক) অর্জিত, (খ) সত্য, (গ) সহজলভ্য, (ঘ) ন্যায্য।

২। **ভেরি**— (ক) শিঙা, (খ) বড় ঢাক, (গ) টিকারা, (ঘ) ঢোলক।

৩। **মৌলী**— (ক) মুকুটধারী, (খ) মূল্যবান, (গ) মূলমন্ত্র, (ঘ) মুকুলিত।

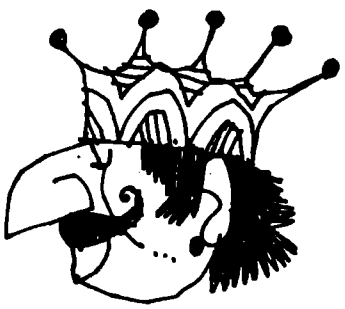

৪। **হদ্দ**— (ক) মোট, (খ) অনেক কিছু, (গ) সীমা, (ঘ) নিশ্চিহ্ন।

৫। **ফৌত**— (ক) মৃত্যু, (খ) পরাজয়, (গ) বশ্যতা স্বীকার, (ঘ) পলায়ন।

উত্তর : ১। **হক**—(ঘ)ন্যায্য।এর মূলে আছে আরবি হক্ক শব্দ, যার অর্থ ন্যায্য বা ঠিক। যেমন, 'হক কথা কওয়ার ভারী জ্বালা' (পাঁচালিকার দাশরথি রায়)। বাংলাভাষায় 'ন্যায্য অধিকার' অর্থেও এর ব্যবহার আছে। যেমন, হকের ধন ছাড়ব কেন ?

২। **ভেরি**— (খ) বড় ঢাক। যেমন, 'দেশ দেশ বন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি' (রবীন্দ্রনাথ)।

৩। **মৌলী**— (ক) মুকুটধারী। যেমন, চন্দ্রমৌলী শিব, তুষারমৌলী হিমালয়।

৪। **হদ্দ**— (গ) সীমা। মূলে আরবি শব্দ হদ্দ, যার অর্থ সীমা। যেমন, লোকটা চোরের বেহদ্দ। এর অর্থ হল লোকটার চৌর্যবৃত্তি সীমাহীন। 'বে' কথার অর্থ 'না'। বাংলায় হদ্দ শব্দটি চূড়ান্ত অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। যেমন, 'হর বলে হদ্দ কৈলে হেমন্তের ঝি' (শিবায়ন)।

৫। **ফৌত**— (ক) মৃত্যু। এটি একটি আরবি শব্দ। যেমন, বাদশার হাজার সৈন্য সেইদিনই ফৌত হল।

দেব-সেনাপতি

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

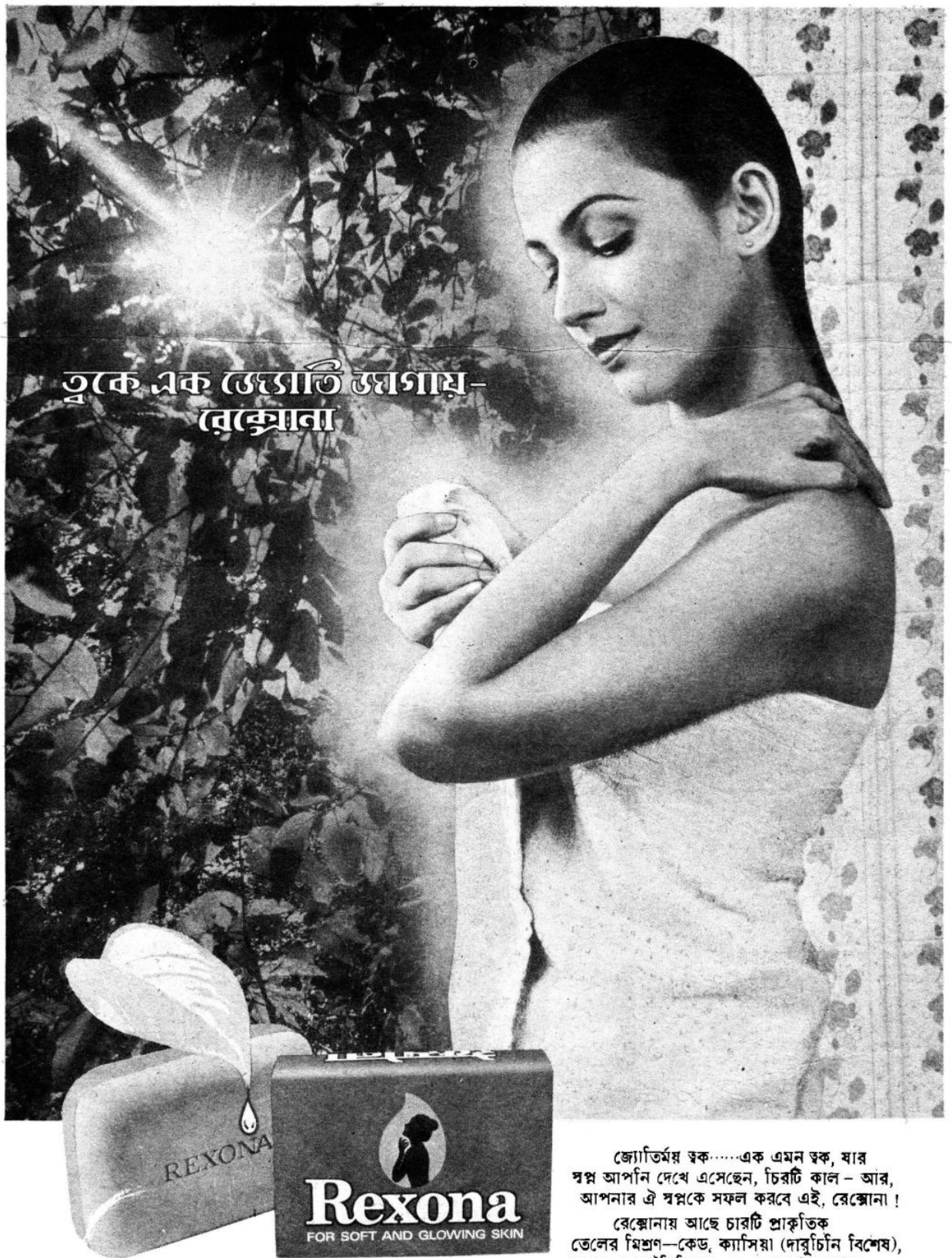

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

দুটি ছড়া

জ্যোতিভূষণ চাকী

কৃতজ্ঞ

পুষেছি দাঁড়কাক,
খাওয়াই দাওয়াই
ঘুমটি পাড়াই
যত্নে তো নেই ফাঁক।

একদিন কাক-মশায়
কথাটি নেই
বাতাটি নেই
চোখ-দুটো ঠোকরায় !

চমকে বলি, "এ কী !
সোনা আমার
মানিক, আমার
সোহাগটা কি মেকি ?"

দাঁড়কাক কয় হেসে,
"যেমন বোকা
তেমনি ধোঁকা,
কাক পোষে কেউ দেশে ?"

বেডিং

বেডিংটা খুলে গেল
ঝুপ্‌ঝাপ্ ঝুপ্
যাত্রীরা চটে লাল
আমি নিশ্চুপ।
ছেঁড়া চটি লণ্ঠন
কম্বল কাঁথা,
মশারির সাথে পড়ে
ফোল্ডিং ছাতা।

ঘড়ির কোকিল

অভীক বসু

বাজার জুড়ে হাজার ঘড়ি
একটা নেওয়া যাক,
দেখতে দেখতে সারা সকাল
হলাম হতবাক।
একটি ঘড়ি নিলাম কিনে
তথ্য সঠিক জেনে,
ঘড়ির মধ্যে কোকিল ছিল
তৈরিও বিগ্‌বেনে
দিন-রাত্তির ডাকত কোকিল
জানিয়ে দিতে সময়
আটটা বাজলে আটটি কুহু,
নটা বাজলেই নয়।
কিন্তু যেদিন ইচ্ছেমতো
ডাকল সে কাকভোরে,
ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকি
পরদাটি ফাঁক করে।
ঘড়ির কোকিল বিগড়ে গেল
ডাকছে বারে বারে
মালুম হল আজ বসন্ত
দেয়াল-ক্যালেণ্ডারে।

বনের রাজা

শিবময় দাশগুপ্ত

ওই ওখানে ঝোপেঝাড়ে,
পাতার সবুজ অন্ধকারে—
বিদঘুটে কে মুখ লুকিয়ে
দেখছে কাকে উঁকি দিয়ে
ওইখানে তুই কিসের খোঁজে যাস রে ?
বুক ছমছম, রক্ত বরফ—
চোখে-মুখে ভয়ের হরফ,
অন্ধ চোখের সোনার খনি
তুই একা রে খোকনমণি ;
আড়াল হলেই চমকে উঠি বাস্ রে !
চাঁদ কপালে দিচ্ছি চুমো,
কোল ঝাঁপিয়ে একটু ঘুমো
ভূত-কিম্ভূত টের পাবে না
হুলো ভুলো হারাবে না
আমাকে কি দুঃখু দিতে চাস রে ?
খোকা মায়ের শুনবে বারণ !
ঘটেছে কী এমন কারণ ?
ছেলেটা যে কী ডানপিটে,
দত্যি-দানোয় ভয় পাবে সে ?
জংলি ঝোপের মায়া তাকে টানছে !
বাবলা-কাঁটা, বটের ঝুরি
ঘোড়ানিম আর তালের গুঁড়ি
দিঘির পাড়ে রোদে উপুড়—
চোখের পাতায় ঘুরছে দুপুর,
নিষেধ ভেঙে অনেক নতুন জানছে।
ফুল, পাপড়ি, শিশির-ফোঁটা—
করমচা নাও গোটা গোটা,
মরা ডালে সাঁকো বানায় ;
কোন্ দুষ্টুর হঠাৎ হানায়
সারাটা বন ওকেই রাজা মানছে !

ছবি : প্রবীর সেন

OMEGA Sony
gives you perfection!

Winner of TOP PLEXCONCIL EXPORT AWARD – 1978–79–80 –81–82–83.

Allied Instruments Pvt. Ltd.,
30-CD Government Industrial Estate,
Kandivli (West), Bombay-400 067.
Phone: 692425 * 685068 * 696721 * 697188.
Telex: 011-3069 AIPL Cable: ARTCORNER.

Omega—The ultimate in quality.

Also Available:
Omega Eagle
Omega Glory
Omega Liba
Omega World Time.

3 Brothers/OS/1585

Distributors: GREATER BOMBAY: M/s. D. Jagjivandas & Company, 177, Abdul Rehman Street, BOMBAY-400 003. Tel. 326524 * MAHARASHTRA: M/s. A. Aalok & Co., 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295, 8823215 * GUJARAT: M/s. N. Chimanlal & Company, Jasmine Bldg., Khanpur, AHMEDABAD. Tel.: 395198 * DELHI, HARYANA PUNJAB, J.K. & HIMACHAL PRADESH: M/s. Bharati Traders, C/o. Kirparam Sethi & Sons, 89, Chawri Bazar, DELHI-110 006. Tel.: 262854 * KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & GOA: M/s. Sanghvi Corporation, "Suresh Building", First Floor, No. 17, 4th Cross, Kalasipalayam, New Extension, BANGALORE: 560 002. Tel.: 225702. * CALCUTTA & WEST BENGAL: M/s. Sanghvi Corporation, 14/1/A, Jackson lane, IInd Floor, Calcutta-700 001. Tel.: 262141. * UTTAR PRADESH: M/s. Sanghvi Corporation, 7 A, Balmiki Marg, Kaisar Baugh, Lucknow (U.P.)-Tel.: 35095. * REST OF INDIA: M/s. Sanghvi Corporation, 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg-Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295-8823215.

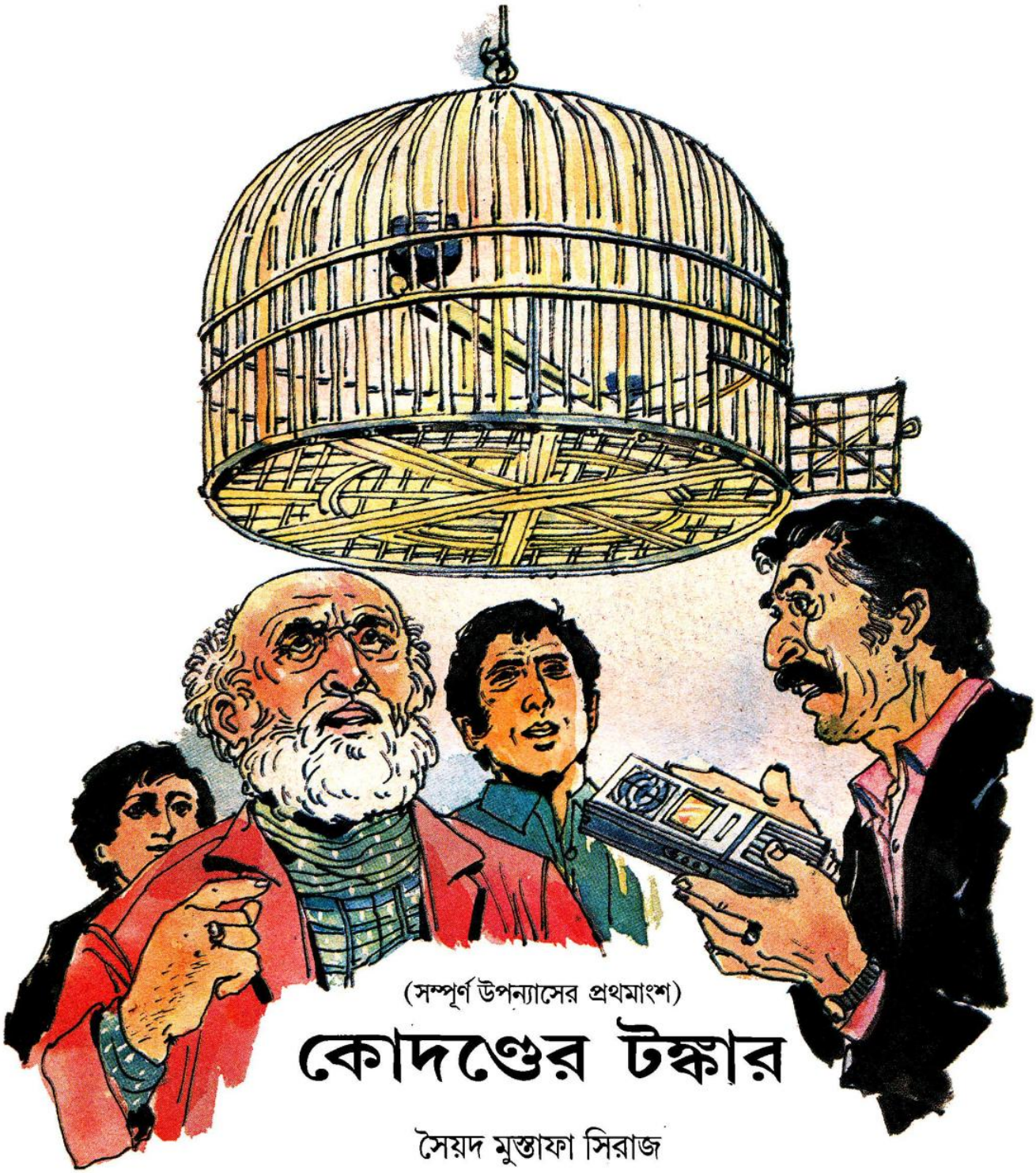

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমাংশ)

কোদণ্ডের টঙ্কার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমে ইদানীং রবিবারের আড্ডাটা দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ দফতরের হোমরাচোমরা লোকেরা তো আসেনই, কর্নেলের মতো রিটায়ার-করা সামরিক অফিসাররাও কেউ কেউ এসে জোটেন। নিজের-নিজের লাইনে সবাই তাঁরা অভিজ্ঞ লোক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কারুর কম নেই। কাজেই প্রত্যেকেরই যেন চেষ্টা থাকে, কে কত সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের টিট করতে পারবেন।

এ রবিবারে কথার সূত্রপাত সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী এক স্মাগলারকে গ্রেফতার নিয়ে। ডিটেকটিভ দফতরের রণবীর মণ্ডল ঘটনার রোমাঞ্চকর জায়গায় সবে পৌঁছেছেন, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বেমক্কা বলে উঠলেন, "ওয়েট, ওয়েট। এভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু মণ্ডলসায়েব তো ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কথা বলছেন। নেপাল বর্ডারে আমি সীমান্ত বাহিনীতে থাকার সময় এক সত্যিকার সন্ন্যাসীকে স্মাগলিংয়ের কারবারে জড়িত থাকার জন্য পাকড়াও করেছিলুম।"

ক্রাইম ব্রাঞ্চের মণি চ্যাটার্জি মুচকি হেসে বললেন, "সত্যিকার সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এঁরা তো মশাই

সংসারত্যাগী পুরুষ ! এঁরা স্মাগলিং করতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?"

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বললেন, "তা বলতে পারব না। যা দেখেছি, তাই বলছি। সন্ন্যাসীর বোঁচকার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল একগাদা কোকেন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি, কয়েক রকম নার্কোটিক্স।"

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রঘুবীর শর্মা তাঁকে সমর্থন করে বললেন, "চ্যাটার্জিসায়েব ! সত্যি বলতে কী, সাধু বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, ফকির বলুন, কেউ সংসারত্যাগী নন।"

চ্যাটার্জি বললেন, "কেন নন ?"

শর্মা হাসলেন। "মশাই, কোনও মানুষের পক্ষে কি সত্যিই সংসার ত্যাগ করা সম্ভব ? একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবেন। ওঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংসার ত্যাগ করেছেন, তার মানে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েছেন। কিন্তু তার বদলে অন্যান্য মানুষকে নিয়েই তাঁদের চলতে হয়। আমাদের মতোই তাঁদের ট্রেনে-বাসে চাপতে হয়।"

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়ি চুলকে মন্তব্য করলেন, "প্লেনেও।"

"হ্যাঁ, প্লেনেও," শর্মা জোর নিয়ে বললেন। "তাছাড়া তাঁদের পেটে খেতেও হয়। না খেলে তো বাঁচা যায় না।"

মণ্ডল বললেন, "শুনেছি, কোনও-কোনও সাধু নাকি স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকেন।"

কর্নেল এক কোনায় বসে আপনমনে আতশকাচ দিয়ে এক টুকরো হাড়ের মতো দেখতে কী একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে ফোড়ন কাটলেন, "সাপকে বায়ুভুক বলা হত প্রাচীনকালে। কথাটা ভুল।"

"ভুল তো বটেই," শর্মা দাপটের সঙ্গে বললেন। "শুধু বাতাস খেয়ে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই যা বলছিলুম, নিছক খাদ্যের জন্যও সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের সংসারের নাগালে থাকতেই হয়।"

চ্যাটার্জি বললেন, "কী বলছেন ! হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কত সাধু থাকেন।"

ইকবাল সিং হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনার কথায় লজিক নেই। যদি দুর্গম স্থানে সত্যি কেউ থাকেন, তাঁকে দেখল কে ? তাছাড়া হিমালয় বাস্তবিক তত দুর্গম নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের পা তার সবখানেই পড়েছে। আমি দেখেছি, হিমালয়ে যত সাধু থাকেন, সকলের ডেরা কোনও-না-কোনও তীর্থে অথবা তীর্থপথের ধারে। তীর্থপথের আনাচে-কানাচেও কাউকে থাকতে দেখেছি। শর্মাসায়েব ঠিকই বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসারত্যাগী বলা হয় বটে, কিন্তু সংসারী মানুষদের ছাড়া তাঁদের চলে না। অবশ্য বলতে পারেন, ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে ঢোকেন তাঁরা।"

মণ্ডল বললেন, "তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য ?"

"মানুষের সমস্ত ক্ষমতা লৌকিক," শর্মা বললেন, "সাধুরা কেউ কেউ ম্যাজিক দেখান আসলে।"

ইকবাল সিং তাঁকে সমর্থন করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, "ম্যাজিক কী বলছেন মশাই ! কোনারকের ওখানে এক সাধুকে এক হাত উঁচুতে, স্রেফ শূন্যে বসে ধ্যানস্থ দেখেছি।"

শর্মা এবং সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণ্ডল বললেন, "বলেন কী ! হঠযোগীরা এমন করেন শুনেছি।"

চ্যাটার্জি বললেন, "নিজের চোখকে তো মশাই অবিশ্বাস করতে পারব না, সে আপনারা যাই বলুন। সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। সাধুবাবা মিনিট-দুয়েক ওইভাবে শূন্যে থাকার পর মাটিতে নামলেন।"

একটু তফাতে আমার পাশে বসে ছিলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার। কে কে হালদার নামে ইদানীং পরিচিত। ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। পেল্লায় গোঁফ। পুলিশের সি আই ছিলেন মফস্বলে। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন গণেশ অ্যাভেনিউতে তিনতলা একটা বাড়ির ছাদে অ্যাজবেস্টসের চাল চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। রাস্তা থেকে সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে : **হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি**। তলায় ইংরেজিতে লেখা : **রহস্যের ধাঁধায় পড়লে চলে আসুন**।

হালদারমশাই আজ কর্নেলের আড্ডায় কেন এসেছেন জানি না। কর্নেলের কাছে বোধ করি কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতেই এসে থাকবেন। হোমরা-চোমরাদের কথার মধ্যে এতক্ষণ নাক গলাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিছুক্ষণ থেকে ওঁকে উসখুস করতে এবং ঘন ঘন নস্যি নিতে দেখছিলুম। বাথরুমে বারবার হাঁচতে যাচ্ছিলেন, সে অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন স্যার—"

ব্রিগেডিয়ার সিং বললেন, "না, না। বলুন, কী বলতে চান।"

হালদারমশাই বললেন, "চ্যাটার্জিসায়েব তো শূন্যে সাধুবাবাকে ধ্যান করতে দেখেছেন। আমি সম্প্রতি কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে আমার এক ভাগ্নে ফরেস্ট অফিসার। খুব তেজী আর সাহসী—"

শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা ! কী দেখেছেন তাই বলুন !"

হালদারমশাই মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, "স্বচক্ষে দেখে এলুম স্যার, এক সাধুবাবা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার দৃশ্য হচ্ছেন। এক্ষুনি অদৃশ্য হচ্ছেন, আর তক্ষুনি দৃশ্য হচ্ছেন। এই অশরীরী, এই শরীরী। একবার দেখছি নেই, একবার দেখছি আছেন।"

বলার ভঙ্গিতেই ঘরে অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। তারপর শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন ? আপনি ?"

"অধমের নাম কে কে হালদার," হালদারমশাই কাচুমাচু মুখে বললেন। "তবে চিনবেন বইকী স্যার ! আপনিই তো আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্সের দরখাস্তে কাউন্টারসাইন করেছিলেন। নইলে লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত।"

শর্মা হাসতে হাসতে বললেন, "তাই বলুন ! আপনিই সেই গোয়েন্দা হালদার ? বুঝেছি। এবার এইসব গুলতাপ্পি ঝেড়ে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব করেছেন বুঝি ?"

বিব্রত হালদারমশাই জিভ কেটে বললেন, "ছি, ছি ! এ কী বলছেন স্যার ! এই জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, ওঁদের দৈনিক সত্যসেবকে এ-খবর বেরিয়েছে কি না।"

চ্যাটার্জি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছিলুম বটে।"

শর্মা আমার দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বললেন, "বাঃ ! তা হলে জয়ন্তকেও ম্যানেজ করে ফেলেছেন ! সত্যি, আপনার কোনও তুলনা হয় না হালদারমশাই !"

আমি ঝটপট বললুম, "কখনও না। খবরটা নিউজ এজেন্সি থেকে পাওয়া। তাছাড়া হালদারমশাইও ব্যাপারটা যে দেখে এসেছেন, এ আমি এইমাত্র শুনছি।"

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "নিউজ এজেন্সির যে রিপোর্টার এই খবর যোগাড় করেছে, তার সঙ্গে হালদারমশাইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না আমরা অবশ্য জানি না।"

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন। "মাই গুডনেস ! সাড়ে দশটা বাজে। করছি কী আমি ? সি পি-র সঙ্গে জরুরি কনফারেন্স ! মিঃ শর্মা, মিঃ মণ্ডল, কী ব্যাপার ? আপনাদের তাড়া দেখছি না যে !"

দুজনেই "তাই তো" বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন পুলিশ-জাঁদরেল কর্নেলের উদ্দেশে "বাই" হেঁকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার সিংও হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ষষ্ঠী ডাইনিং ঘরের দরজায় পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছিল। বলল, "যা বাব্বা ! আবার যে কোফি করলুম একগাদা। খাবে কে এত ?"

কর্নেল হাড়ের মতো জিনিসটা আর আতশকাচ রেখে বললেন, "কোফি করেছিস ?"

"আজ্ঞে বাবামশাই।"

কর্নেল হালদারমশাইয়ের উদ্দেশে বললেন, "কী হালদারমশাই, সাধুকে তো অদৃশ্য হতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোফি খেয়েছেন কি ? এ বস্তু একমাত্র ষষ্ঠীই বানাতে পারে।"

ষষ্ঠী ট্রে নিয়ে আসছিল। জিভ কেটে বলল, "কঁফি ! কঁফি !"

"ঠিক আছে। কঁফিই খাওয়া যাক।" কর্নেল উঠে আমাদের কাছে এসে বসলেন।

কর্নেলের এ পরিহাসে মন নেই হালদারমশাইয়ের। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী রকম অপমানিত হলুম দেখুন কর্নেল ! আপনার মতো বহুদর্শী জ্ঞানী লোক আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর এই সব পুঁচকে ছোকরা অফিসার—আমার ছেলের বয়সী সব !"

"দুঃখ করবেন না হালদারমশাই," কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। তারপর নিজের হাতে কফি ঢেলে প্রচুর দুধ মিশিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। "বাস্তব কিছু-কিছু ঘটনা অনেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। জানেন তো, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান ?"

বললুম, "কোদণ্ডগিরির সাধুর ব্যাপারটা আপনি বাস্তব ঘটনা বলছেন নাকি ?"

**"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো
তোমার খেলাঘর!"**

— **ফেভি ফেয়ারী**

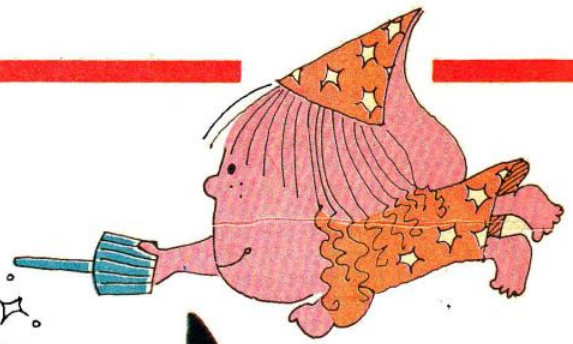

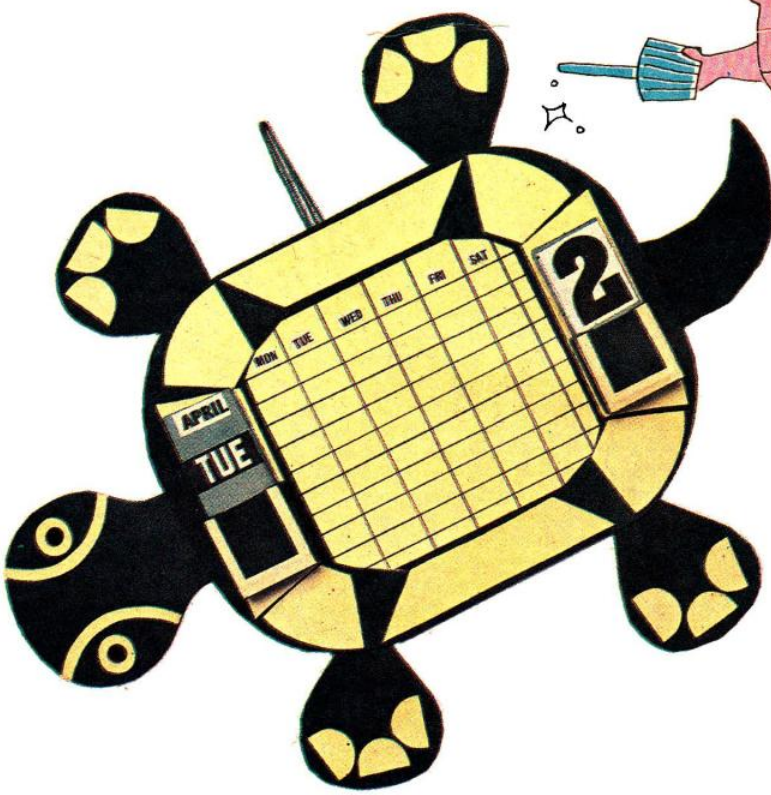

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা–হাতি–বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

'টাফি দি টর্টয়েজ' কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

'টাফি দি টর্টয়েজ' কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ____________________

বয়স: ____________________

ঠিকানা: ____________________

____

শহর: ____________________

রাজ্য: __________ পিনকোড: __________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্রাফট পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না

(AM)

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি [logo] আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-4864 BN

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হালদারমশাই সড়াক শব্দে গরম কফি টেনে ব্যস্তভাবে গিলতে গিলতে বললেন, "বাস্তব মানে ? স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি। মাত্র একটা ঝরনার এধার-ওধার। ওধারে পাথরের ওপর সাধুবাবা, এধারে পাথরের আড়ালে আমি।"

"দিনে, না রাত্তিরে ?"

"রাত্তিরে। তবে জ্যোৎস্না ছিল। পরিষ্কার ঝলমলে আলো। তাছাড়া শুধু ওখানে নয়, পরে ট্রেনেও।"

ফোন বাজলে ওঁর কথায় বাধা পড়ল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, "কে ? কে কে হালদার ? হুঁ, আছেন। ধরুন, দিচ্ছি।"

হালদারমশাই খপ করে ফোন কেড়ে নিয়ে চড়া গলায় বললেন, "দুলাল নাকি ?...কী ? পালিয়ে গেছে ? হতভাগা বাঁদর ছেলে ! তোকে পইপই করে বলা আছে...না, না। কোনও কথা শুনতে চাইনে তোর। যেমন করে পারিস, খুঁজে ধরে নিয়ে আয়। নইলে...হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে...কাছাকাছি...যত্ত সব !"

শব্দ করে ফোন রেখে হালদারমশাই গোঁজ হয়ে বসলেন। কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, "পাখি নাকি ?"

"হুঁঃ !"

"কথা-বলা পাখি ?"

"হুঁঃ !"

বুঝতে পারছিলুম, হালদারমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন এবং আনমনে হুঁঃ দিচ্ছেন শুধু। এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "কথা-বলা পাখিটা কি কোদণ্ডগিরির জঙ্গল থেকে এনেছিলেন হালদারমশাই ?"

কৃতান্ত হালদার তড়াক করে ঘুরে বললেন, "আরে, ওটার ব্যাপারেই তো আসা আপনার কাছে। এখন দেখুন তো কী করি ! আমার ভাগ্নে দুলালকে নজর রাখতে বলে এসেছিলুম। পর-পর দু'রাত্তির বাড়িতে চোর আসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, চোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। তখন পাখিটাও শিস দেয়। বড় রহস্যময় ব্যাপার নয়, কর্নেল ?"

"রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। তা পাখিটা পালাল কীভাবে ?"

"দুলাল বলল, বাইরে কে ডাকছিল। গিয়ে দ্যাখে, কেউ না। তারপর ফিরে এসে দ্যাখে, বারান্দার খাঁচা খোলা। অথচ দেখুন, বারান্দায় গ্রিল আছে।"

"বাড়িতে আর কোনও লোক নেই ?"

"আজ্ঞে না।" হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে অনেকটা নস্যি নাকে গুঁজে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু হাঁচি এল না।

কর্নেল বললেন, "পাখিটা কি কাকাতুয়া, না ময়না ?"

"ময়না," হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন। "ওটার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে আসা কর্নেলস্যার ! আপনি ঠিকই ধরেছেন। কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে একটা আদিবাসী ছেলে ফাঁদ পেতে পাখিটা ধরেছিল। কথা বলতে পারে দেখে কিনে নিয়েছিলুম।"

"তাহলে নিশ্চয় কারুর পোষা পাখি। উড়ে গিয়ে জঙ্গলে বেড়াচ্ছিল।"

"ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা কোনও রহস্য নয়। রহস্য হল পাখিটার বুলি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম, বলছে : মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম। গঙ্গারাম কেন গঙ্গারামকে কিল করবে, এটা একটা রহস্য নয় স্যার ?"

"অবশ্যই।" কর্নেল পর্যায়ক্রমে টাক এবং সাদা দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে থাকলেন।

বুঝলুম, রহস্যটা মনে ধরেছে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর। তাতে আরও একটু যোগান দেবার ইচ্ছেয় বললুম, "রাত্তিরে চোর এসে শিস দিচ্ছিল বললেন হালদারমশাই !"

হালদারমশাই বললেন, "আর পাখিটাও পালটা শিস দিচ্ছিল ! মজাটা বুঝুন একবার।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "সুতরাং রহস্য ঘনীভূত হল বলা যায়।"

আমি বললুম, "হালদারমশাই, এর সঙ্গে সেই অদৃশ্য হতে পারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর ব্যাপারটার কোনও যোগাযোগ নেই তো ?"

হালদারমশাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "আছে বলেই তো কর্নেলস্যারের কাছে আসা। ট্রেনে পাখিটাকে লুকিয়ে আনছিলুম। নইলে রেলবাবুরা আপত্তি করতেন। তো মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, এক সাধু আমার বাংকের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তড়াক করে উঠে বসেছি। আর অবাক কাণ্ড, সাধু অদৃশ্য। বেমালুম হাওয়া।"

কর্নেল বললেন, "আশা করি, স্বপ্ন দেখছিলেন না ?"

"কখনও না। ট্রেন জার্নিতে আদপে আমার ঘুম হয় না।"

আবার ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়েই কৃতান্ত হালদারকে দিলেন। হালদারমশাই আগের মতো চড়া গলায় বললেন, "দুলাল ?...কী ? লোম ? সাদা লোম ? বলিস কী ?...যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।"

ফোন ছেড়ে উত্তেজিতভাবে হালদারমশাই বললেন, "কর্নেল, এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন দয়া করে। খাঁচায় আর বারান্দা জুড়ে একগাদা সাদা লোম দেখতে পেয়েছে দুলাল। কী সাংঘাতিক রহস্য বুঝুন।"

॥ দুই ॥

"এই লোমরহস্য আমার তত সাংঘাতিক মনে হচ্ছে না হালদারমশাই," কর্নেল সাদা লোমগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন। "এগুলো নিছক বাঁদরের লোম। তবে সাধারণ বাঁদর নয়, খুদে বাঁদর। স্কুইরেল মাংকি বলে যাদের।"

কৃতান্ত হালদার অবাক হয়ে বললেন, "স্কুইরেল মানে তো কাঠবেড়ালি !"

"হ্যাঁ। কাঠবেড়ালির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বটে। বাঁদরটা দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা। দিব্যি পকেটে রাখা যায়।"

"কিন্তু এখানে কোত্থেকে এল অমন উদ্ভুট্টে জীব ? কিছু যে বোঝা যাচ্ছে না স্যার !"

কর্নেল গ্রিল-দেওয়া বারান্দায় একটু ঘোরাঘুরি করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন, "পাখিটার কিছু পালক পড়ে আছে দেখেও বুঝতে পারছেন না ?"

"আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, কর্নেল !" বারান্দায় একটা চেয়ারে হতাশভাবে বসে পড়লেন হালদারমশাই।

"ডাক্তার পরের রোগ ধরে চিকিৎসা করেন ! কিন্তু নিজের রোগ হলে অন্য ডাক্তার ডাকেন। কেন ডাকেন, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। উরেব্বাস ! বিস্তর রহস্য ঘেঁটেছি, এবার আমাকেই রহস্য-রোগ এসে জাপটে ধরেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "স্কুইরেল মাংকির লোম আর ময়নাপাখির পালক পড়ে থাকাটা মূল রহস্যরোগ নয়, হালদারমশাই ! নেহাত উপসর্গ।"

কখন থেকে মুখ খোলার জন্য উসখুস করছিলুম। এবার বললুম, "ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি মনে হচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "বলো ডার্লিং !"

"কেউ একটা ট্রেণ্ড খুদে বাঁদর পাঠিয়ে পাখিটা খাঁচা থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা করে বাইরের দরজায় কলিং বেল টিপেছে। দুলাল দেখতে গেছে কে ডাকছে, আর এদিকে তার বাঁদর গ্রিলের ভেতর দিয়ে ঢুকে খাঁচা খুলে পাখিটা ধরেছে। পাখি আর বাঁদরে একটু ধস্তাধস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই এসব লোম আর পালক।"

কৃতান্ত হালদার লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। "শাবাশ জয়ন্তবাবু ! শাবাশ ! দেখছেন ? এই সামান্য ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না।"

কর্নেল ততক্ষণে বাইরে চলে গেছেন। বাড়িটা একতলা এবং পুরনো পূর্ব শহরতলি এলাকার নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত। আশেপাশে পোড়ো জঙ্গলে জমি, একটা পুকুর আর প্রচুর গাছপালাও রয়েছে। কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে। তার ওধারে একটা বিস্তীর্ণ মুসলিম গোরস্থান। এমন জায়গায় শুধু চোর কেন, ভুতপেরেতদেরও দিনদুপুরে হানা দেওয়া স্বাভাবিক।

হালদারমশাইয়ের ভাগ্নে শ্রীমান দুলালের বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। সবে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। মামার মতোই লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। মুখচোরা ছেলে বলে মনে হচ্ছিল। এই কাণ্ডের পর বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে খালি। আমার কথা শোনার পর সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাইরের দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন রাস্তা দেখছি, পাখিটার চ্যাঁচামেচি কানে এসেছিল যেন। এতক্ষণে মনে পড়ল।"

ভাগ্নেকে ভেংচি কেটে হালদারমশাই বললেন, "অ্যাঁতক্ষণে মনে পঁড়ল ! স্কুলে তুই স্ট্যাণ্ড করিস্ না হাতি করিস ! মুখস্থ বিদ্যের শিরোমণি ! রিয়্যাল লাইফে তুই স্ট্যাণ্ড করতে পারবি ভেবেছিস ? সে-গুড়ে বালি।"

দুলালকে কাছে টেনে নিয়ে বললুম, "আহা ! মিছিমিছি ওকে বকবেন না হালদারমশাই ! আপনি বাড়িতে একা থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত না কি ?"

বুঝতে পেরে হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। গোঁফ চুলকে বললেন, "কিন্তু মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম। ব্যাপারটা কী বলুন তো ? পাখিটা এমন উদ্ভুট্টে কথা শিখল কী করে ? ধরে নিচ্ছি, কেউ শিখিয়েছে। কিন্তু গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করে কীভাবে ? সুইসাইড মনে হয় না আপনার ?"

বললুম, "হ্যাঁ, সুইসাইড ধরে নিলে একটা অর্থ দাঁড়ায়।"

কর্নেল বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখানে আর কোনও সূত্র মিলবে না, হালদারমশাই ! কোদণ্ডগিরিতে গেলে কিছু সূত্র মিলতেও পারে। পাখিটা যখন সেখানেই পেয়েছিলেন !"

হালদারমশাই বললেন, "তা না হয় যাওয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারাম ইজ কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা, তাতে জয়ন্তবাবু আর আমি একমত হয়েছি কর্নেলস্যার !"

কর্নেল আনমনে বললেন, "পাখির কথা ঠিকমতো বুঝতেও ভুল হতে পারে। আমি একবার শুনতে পেলে হয়তো বুঝতে পারতুম, ঠিক কী বলছে।"

দুলাল নড়ে উঠল। "আমি টেপ করে রেখেছি। শুনবেন ?" বলে দৌড়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এল।

কৃতান্ত হালদার খি-খি করে হেসে বললেন, "ওর জন্মদিনে আমার ছোটবোন—মানে ওর মাসি প্রেজেণ্ট করেছে। দেখছেন কাণ্ড ? পাখির কথা টেপ করে বসে আছে।"

টেপ চালিয়ে দিল দুলাল। প্রথমে কিছুক্ষণ কাক আর চড়ুইদের ডাক শোনা গেল। তারপর শোনা গেল দুলালের গলা। "নাও বিগিন মিঃ ব্ল্যাকি ! বিগিন !···ও-নো নো ! প্লিজ মিঃ ব্ল্যাকি !" তারপর শিসের শব্দ। ময়নাপাখির গায়ের রং কালো। ঠোঁট টুকটুকে হলুদ। দুলাল ওকে মিঃ ব্ল্যাকি নাম দিয়েছিল তাহলে ! একটু পরেই ব্ল্যাকির কথা শোনা গেল : "মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম।" একবার নয়। বার পাঁচ-ছয় একই কথা।

কর্নেল বললেন, "আরেকবার টেপটা চালাও তো দুলাল।"

দুলাল টেপটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল রিভার্স বোতাম টিপে। তারপর প্লে বোতামটা টিপল। আবার সেইসব শব্দ। দুলালের কথা। তারপর পাখির গলা।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। দুলাল টেপ বন্ধ করে বলল, "আবার চালাব কর্নেলদাদু ?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "না। হালদারমশাই, আপনি ভুল শুনেছেন।"

"ভুল ?" হালদারমশাই বললেন। "সে কী ! গঙ্গারামই তো বলল। তাই না জয়ন্তবাবু ?"

সায় দিয়ে বললুম, "তাই তো মনে হল।"

কর্নেল বললেন, "পাখিটা বলছে, মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই বংকারাম।"

"বংকারাম ! এমন নাম আবার হয় নাকি ? গঙ্গারাম নাম শুনেছি বটে।"

"হয় ডার্লিং !" কর্নেল একটু হাসলেন। "কোদণ্ডগিরি তো ওড়িশায়। ওড়িশায় বংকাবিহারী, বংকারাম এসব নাম খুব কমন।"

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, "তাহলে তো আর দেরি করা উচিত নয়, স্যার ! এখনই কোদণ্ডগিরি রওনা দিতে হয়।"

একটু পরে হালদারমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমার সাদা ফিয়াট গাড়িটা আস্তেসুস্থে চালিয়ে আনছিলুম। দু'দিন থেকে গণ্ডগোল করছে গাড়িটা। যখন-তখন অদ্ভুত শব্দ করতে করতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু ঠেলে দিলে আবার স্টার্ট নিচ্ছে অবশ্য। ওবেলা গ্যারেজে না দিলেই নয়।

আজ হালদারমশাইয়ের বাড়ি আসার সময় কোনও গণ্ডগোল করেনি। কিন্তু ফেরার পথে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে পৌঁছেই ঘড়ঘড় করতে করতে থেমে গেল। একটু হেসে বললুম, "কর্নেল! ঠেলতে হবে।"

কর্নেল গুম হয়ে বসে ছিলেন। চোখ বন্ধ এবং দাড়িতে আঙুলের চিরুনি। বুঝতে পারছিলুম, গোয়েন্দাপ্রবর গঙ্গারাম বনাম বংকারাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার কথায় চোখ খুলে বেজায় চমকানো গলায় বললেন, "কী বললে?"

"ঠেলতে হবে।" বলে দরজা খুলে সবে নেমেছি, অবাক হয়ে দেখলুম কর্নেলও হন্তদন্ত নামলেন বটে, কিন্তু নেমেই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করেছেন। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর দেখি উনি সামনের বাসস্টপে সদ্য-এসে-দাঁড়ানো একটা বাসের পাদানিতে উঠে পড়লেন। তারপর বাসটা ছেড়ে গেল।

এতকাল ধরে ওঁর বিস্তর উদ্ভুটে আচরণ দেখে আসছি। কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। রাগ করার মানে হয় না, বিশেষ করে এমন একটা ক্ষেত্রে। ফুটপাথের বাসিন্দা একদঙ্গল ছেলে আমার অবস্থা দেখে দৌড়ে এল। তাদের কিছু বলতে হল না। তারা গাড়িটা ঠেলতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট নিলে তাদের বখশিশ দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চললুম।

ছুটির দিন আজ। কাগজের আপিসে যাওয়ার তাড়া নেই। খেয়েদেয়ে অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিয়ে যখন উঠে পড়লুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মার্চের মাঝামাঝি বেশ গরম পড়েছে। লোডশেডিং না হয়ে গেলে ছ'টা অব্দি বিছানায় পড়ে থাকতুম।

ব্যালকনিতে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছি, আমার রাঁধুনি-কাম-কাজের ছেলে ফটিক এসে বলল, "সেই দাড়িওলা সায়েব এসেছেন দাদাবাবু!"

তারপর কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম, "ডার্লিং, আশা করি এ-বুড়োর ওপর থেকে রাগটা এতক্ষণে পড়ে গেছে। হুঁ, মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, প্রিয় ভাতঘুমখানা চমৎকারই হয়েছে। রাগের পক্ষে নিরেট একখানা ঘুমই যথেষ্ট। যাই হোক, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন সওয়া ছটায় ছাড়বে হাওড়া থেকে। ভাগ্যিস মিঃ রাঘবনকে ফোনে পেয়েছিলুম। আস্ত একখানা ক্যুপের ব্যবস্থা করা গেছে।" কর্নেল আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। "উঠে পড়ো, উঠে পড়ো! হালদারমশাই এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে হাপিত্যেশ করছেন আমাদের জন্য।"

কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ভাবলুম, তখন অমন করে হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইব। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর তখনকার মতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের চিরুনি চালাচ্ছেন এবং বলা যায় না, তখনকার মতোই যদি হঠাৎ 'রোখ্‌কে' বলে ট্যাক্সি থামিয়ে আবার বেমক্কা অদৃশ্য হয়ে যান। ওঁকে বিশ্বাস নেই। অতএব চেপে গেলুম।

দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে কৃতান্ত হালদার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন, "পাখি বাঁদর সাধু! সব একত্র, সব!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "একবার শরীরী, একবার অশরীরী? এই আছে, এই নেই!"

হাত প্রচণ্ড নেড়ে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আপন গড। একটু আগে এক সাধু আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকাতে তাকাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। তার কাঁধের ঝোলায় স্পষ্ট দেখলুম এতটুকু একটা বাঁদরের মুণ্ডু উঁকি মেরে আছে।"

বললুম, "আর পাখি?"

কর্নেলের পেছন-পেছন হালদারমশাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন, "পাখিটা নির্ঘাত ঝোলার ভেতর আছে। এটা অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন না? সাধু আর বাঁদর যেখানে, পাখি সেখানে থাকতে বাধ্য। আর জানেন? সাধু একা নয়, তার সঙ্গে একজন চেলাও আছে দেখলুম।"

কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের ক্যুপটা পেছনে গার্ডের কামরার লাগোয়া। সামনে একটা গুডস কম্পার্টমেন্ট। ছোট্ট ক্যুপে মাত্র তিনটে বাংক। জিনিসপত্র রেখে আমি ও কর্নেল বসে পড়লুম। হালদারমশাই সাধুবাবাকে খুঁজতে গেলেন। গাড়ি ছাড়ার এখনও মিনিট-দশেক দেরি আছে। ভাবলুম, ট্রেন ছাড়লে তবে কর্নেলের অমন করে ছুটে গিয়ে বাসে ওঠার ব্যাপারটা তুলব। কর্নেল আর যাই করুন চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবেন না নিশ্চয়।

কর্নেল চুরুটের বাক্স বের করে পছন্দসই একটা চুরুট বেছে নিলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎ বললেন, "ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের কথা

নটি ছড়ার বইতে যেন নতুন এক নবরত্ন-সভা

ছড়া শুনতে কার না ভাল লাগে বলো ? শুধু কি শোনা ? ছড়া মুখস্থ করতেও দারুণ লাগে, তাই না ? আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তোমাদের জন্য ন-নটি ছড়ার বই বেরিয়েছে। বলতে গেলে, এ যেন নতুন এক নবরত্ন-সভা।

কিংবা বলা যায়, আহ্লাদে আটখানা, তার উপরে আবার একটা ফাউ। নটি বইই দারুণ। যেমন ধরো, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'হৈ রে বাবুই হৈ'। পড়লেই হইহই করতে ইচ্ছে হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছড়া যায় ছড়িয়ে' মাথার মধ্যে ঠিক ছড়িয়ে যায়। আবার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো'তে চেনা-চেনা শব্দ দিয়ে দারুণ মজার-মজার মিল। মজা বলতেই মনে পড়ে যায় 'সাদা বাঘ'-এর কথা। এ-বাঘ মোটেই দূর থেকে দেখার নয়, কোলের পাশে রেখে আদর করার। কেননা, বিমল দাসের ছবিতে আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়াতে এক অসামান্য উপহার 'সাদা বাঘ'। আবার আদিনাথ নাগের 'হিজঙ্গলের দেশে' বা গৌরী ধর্মপালের 'ঘোড়া যায়'—এ-দুটোও কম মজাদার ছড়া দিয়ে ভর্তি নাকি ? কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা বলি ? মৌমাছির 'মৌ-মিছরি-মণ্ডা'তে খুব ছোট্ট, আরো বড়ো আর তারো বড়োদের জন্য তিনরকম ছড়া। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মামার বাড়ী'। পড়ে ছড়ার সঙ্গে শেখা যায় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ। সুধীর মৈত্রের ছবিতে সাজানো এবং রমাপদ চৌধুরীর ছড়াতে রাঙানো 'ভূতগুলো সব গেল কোথায়'ও দুর্ধর্ষ এক উপহার। তাই সব কটা বই-ই চাই। কাল নয়, এক্ষুনি।

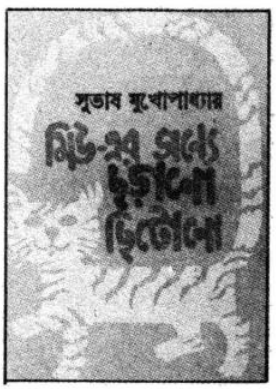

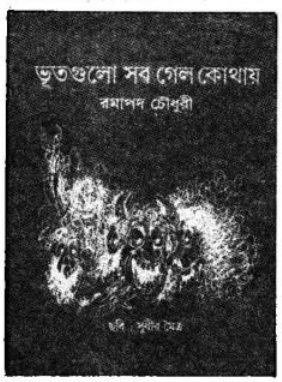

ছড়ার বই :

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ হৈ রে বাবুই হৈ ॥ ৬·০০ ● প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ছড়া যায় ছড়িয়ে ॥ ৫·০০ ● সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো ॥ ৬·০০ ● নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাস ॥ সাদা বাঘ ॥ ১০·০০ ● মৌমাছি ॥ মৌ মিছরি মণ্ডা ॥ ১০·০০ ● রমাপদ চৌধুরী ও সুধীর মৈত্র ॥ ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ ২০·০০ ● যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ মামার বাড়ী ॥ ৮·০০ ● গৌরী ধর্মপাল ॥ ঘোড়া যায় ॥ ৬·০০ ● আদিনাথ নাগ ॥ হিজঙ্গলের দেশে ॥ ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

তোমার মনে থাকা উচিত, ডার্লিং !"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "খুব মনে আছে। ফোরেনসিক এক্সপার্ট সেই ওড়িয়া ভদ্রলোক তো ?"

"শুধু ফোরেনসিক এক্সপার্ট নন উনি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ওঁর অগাধ জ্ঞান। যেমন ধরো, আণবিক জীববিজ্ঞান, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান। এমনকী, সম্প্রতি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ওঁর একটা গবেষণাপত্র বিদেশে খুব হইচই সৃষ্টি করেছে। এমন অল-রাউণ্ডার জিনিয়াস সচরাচর দেখা যায় না—বিশেষ করে যুগটা যখন স্পেশালিস্টদেরই, তখন এতগুলো বিদ্যায় যিনি সমান স্পেশালিস্ট তাঁকে এতদিন কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি, জানি না।"

কর্নেলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললুম, "দেবে'খন। কিন্তু হঠাৎ ডঃ পট্টনায়কের কথা কেন ?"

কর্নেল হাসলেন। "সম্প্রতি ডঃ পট্টনায়ক কলকাতা এসেছেন। সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং সেন্টারটা তুমি দেখে থাকবে, জয়ন্ত। আজ রবিবার বারোটায় ওঁর সেখানে একটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল।"

"কী কাণ্ড !" হাসতে হাসতে বললুম। "তাই হঠাৎ অমন করে দৌড়ে গেলেন—"

আমার কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "তুমি যেই বললে 'ঠেলতে হবে' অমনি প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের মতো আমার মাথা খুলে গিয়েছিল। সেই ইউরেকা ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল আর কি ! তক্ষুনি ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির হলে পৌঁছে ডঃ পট্টনায়কের কানে কানে বললুম, রহস্য ফাঁস করেছি ডঃ পটনায়ক ! PUSHPA শব্দটা আসলে PUSH PANEL A অর্থাৎ এ-মার্কা প্যানেলটা ঠেলতে হবে। খামোখা পুষ্প বা ফুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম।"

"কিন্তু জিনিসটা কী ?"

"জিনিসটা আজ সকালে তুমি আমার হাতে দেখেছ, ডার্লিং !"

"ভ্যাট ! ওটা তো একটুকরো হাড় বলে মনে হচ্ছিল, কিংবা পাথুরে ফসিল !"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "মোটেও না জয়ন্ত ! ছোট্ট মাউথ অর্গানের মতো জিনিসটা আসলে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। দুটো প্যানেলে ভাগ করা, এ এবং বি। এ-কে ঠেলে দিতেই ওটা চালু হয়ে গেল। কিন্তু আমার বা ডাঃ পটনায়কের তো জানা নেই মূল কোন যন্ত্রকে এটা চালিত করে দূর থেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বি প্যানেলটা ঠেলে নিষ্ক্রিয় করে দিলুম। হ্যাঁ, তোমাকে বলা উচিত, এই অদ্ভুত যন্ত্রটা মাস দুই আগে পটনায়কই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পার্বতী নদীর বালির চড়ায়। বালিতে প্রায় পুরোটা ঢাকা অবস্থায় ছিল। কিন্তু সিলিকন ধাতুর পাতে মোড়া। তাই ময়লা হয়ে গেলেও নষ্ট হয়ে যায়নি।"

"পার্বতীনদীর নাম তো কখনও শুনিনি ! সেটা আবার কোথায় ?"

"কোদণ্ডগিরি এলাকায়।"

"কী ?" আমি নড়ে বসলুম এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, "সুতরাং হালদারমশাই আসার আগেই কোদণ্ডগিরি যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম ভেতর-ভেতর। যথাসময়ে জানতে পারতে। আশা করি, কাল সকালের মধ্যে ডঃ পটনায়কও প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাবেন। কোদণ্ডগিরি টাউনশিপে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর কাজে নামব আমরা।"

এই সময় হালদারমশাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, "সাধু, পাখি, বাঁদর—সব একত্র। সামনে দুটো কম্পার্টমেণ্টের পরেরটায় উঠেছে। কর্নেলস্যার! রহস্য একেবারে জমজমাট।"

॥ তিন ॥

হালদারমশাই বলেছিলেন, ট্রেন জার্নিতে তাঁর নাকি আদপে ঘুমই হয় না। অথচ সারা পথ দেখলুম, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ওপরের বাংকে ঘুমোচ্ছেন। ভোর সাড়ে-ছ'টায় কোদণ্ডগিরি স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে, তখনও উনি ঘুমে কাঠ। ওঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে বসলেন এবং বললেন, "খড়্গপুর এল মনে হচ্ছে।"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "না হালদারমশাই, কোদণ্ডগিরি এসে গেছি। নিন, উঠে পড়ুন।"

হালদারমশাই "অ্যাঁ" বলে দমাস করে বাংক থেকে লাফ দিলেন। ট্রেন তখনও থেমে যায়নি। সেই অবস্থায় দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে আর একটা ঝাঁপ দিলেন। আছাড়ও খেলেন দেখলুম। তারপর আর ওঁকে দেখতে পেলুম না। বুঝলুম সাধু, পাখি ও বাঁদরের খোঁজেই উধাও হলেন।

সত্যিই উধাও। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর ঢোঁড়াঢুঁড়ি করেও আর ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ওঁর বোঁচকা আমাকেই বইতে হল। কর্নেলকে কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন মনে হল না। নির্বিকার মুখে বললেন, "চলো জয়ন্ত, আমাদের এখন প্রায় বারো কিলোমিটার পাড়ি জমাতে হবে। হালদারমশাইয়েরই ভাগ্নেবাড়ি। কাজেই যথাসময়ে উনি পৌঁছে যাবেন।"

একটা অটো-রিকশো ভাড়া করে আমরা রওনা দিলুম। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছিল না। হালদারমশাই কোনও বিপদে পড়েননি তো? কর্নেল সেটা আঁচ করে মৃদু হেসে বললেন, "ভেবো না জয়ন্ত! হালদারমশাই সারা জীবন পুলিশে চাকরি করেছেন। তত নিরীহ মানুষ নন।"

তবু আমার উদ্বেগ রয়ে গেল। স্টেশনের আশেপাশে খনি এলাকা। চারদিকে রুক্ষ টিলাপাহাড় আর কলকারখানা। অনেকটা গিয়ে তারপর সবুজের ছোপ চোখে পড়ল। পুরনো কোদণ্ডগিরি আসলে একটা গ্রাম। তার পাশ দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। পার্বতী নদীর ব্রিজ পেরিয়ে টাউনশিপ শুরু। এটাই নতুন কোদণ্ডগিরি এবং চেহারা-চরিত্রে আধুনিক শহর। এবার উঁচু পাহাড় চোখে পড়ছিল। টাউনশিপটা সেই সব পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকায় গড়ে উঠেছে।

টাউনশিপ ছাড়িয়ে আবার পার্বতী নদী চোখে পড়ল। একেবারে নদীর ধারেই একটা টিলার গায়ে সুন্দর ছবির মতো একটা বাংলোবাড়ি দেখিয়ে কর্নেল বললেন, "ওই দ্যাখো জয়ন্ত, ওটাই কোদণ্ডগিরি ফরেস্ট কনজারভেটর প্রদীপ রায়ের বাংলো। আমাদের হালদারমশাইয়ের অসংখ্য ভাগ্নের একজন।"

বলে উনি বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন। হাইওয়ে ছেড়ে আমাদের অটো-রিকশো প্রাইভেটে রোডে ঢুকল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে টিলায় উঠেছে। গেটের কাছে একজন শক্তসমর্থ গড়নের এবং সাদা স্পোর্টিং শার্ট, শর্টস ও টেনিস জুতো পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার টুপিটাও সাদা। আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ইনিই প্রদীপ রায়।

প্রদীপবাবু একটু হেসে বললেন, "একটু আগে মামাবাবু ফোন করছিলেন স্টেশন থেকে। একটা কাজে আটকে গেছেন। পৌঁছুতে সামান্য দেরি হতে পারে। অবশ্য আপনাদের খবরও মামাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, কাল থেকে আমার জিপটা গ্যারেজে। নইলে আপনাদের আনার জন্য পাঠিয়ে দিতুম।"

তাহলে গোয়েন্দাগিরিতে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন হালদারমশাই। হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। বাংলোর দক্ষিণ-পূর্ব কোনার সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন প্রদীপবাবু। দ্রুত ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলেন আমাদের। তারপর কফির পেয়ালা হাতে গল্প করতে থাকলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের আসার কথা গতকাল বিকেলেই ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হালদারমশাই। ভুবনেশ্বর থেকে ডঃ সীতাকান্ত পটনায়কের আসার কথাও বলেছেন।

আমরা দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিলুম। পার্বতী নদী এই টিলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিয়ে বইছে। কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। নদীটা মাঝারি গড়নের। বিশেষ জল নেই, খালি বালি আর পাথরে ভর্তি। ওপারে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। কাছে এবং দূরে প্রায় সব পাহাড়ই জঙ্গলে ঢাকা। ওই জঙ্গল পুরোটাই সংরক্ষিত এবং পশুপাখিদের অভয়ারণ্য। তাই গাছ কাটতে দেওয়া হয় না। প্রদীপবাবু বলছিলেন, তবু লুকিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় লোকে। চোরাশিকারিদেরও খুব উপদ্রব। কালই একটা শম্বর মেরেছিল। নিয়ে যেতে পারেনি ফরেস্ট গার্ডদের তাড়া খেয়ে। শেষে শম্বরের মাংসটা আদিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। এই জঙ্গলকে ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই চোরাশিকারি বা গাছ-চোরদের দেখলে ওরা নিজেরাই তাড়া করে, আবার খবরও দিয়ে যায় চুপিচুপি।

কর্নেল হঠাৎ বললেন, "আপনার মামাবাবু একটা ময়নাপাখি কিনেছিলেন এখানে। পাখিটা নাকি অদ্ভুত কথা বলে!"

প্রদীপবাবু বললেন, "হ্যাঁ—পাখিটা চুরি গেছে শুনলুম। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত, জানেন? দিন-পনেরো আগে মামাবাবু এসেছিলেন বেড়াতে। যাবার দিন জঙ্গলে কোথায় একটা আদিবাসী ছেলের কাছে পাখিটা কেনেন। পাখিটা আর কোনও কথা বলে না। খালি বলে, 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম।' গঙ্গারাম কে, কে জানে! আর গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করল, এর মানেই বা কী?"

কর্নেল বললেন, "উঁহু, ভুল শুনেছেন। কথাটা হবে 'আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই বংকারাম।' গঙ্গারাম নয়।"

(আগামী সংখ্যায় শেষাংশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বুটিদার ফেট্টি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আট বছর ধরে শার্লক হোমসের সঙ্গে-সঙ্গে থেকে যে গোটা সত্তর কেস-এর তদন্ত ও ফলাফল দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে সেগুলোর সবকটাই আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। যখনই হাতে সময় থাকে তখন এই ডায়েরির পাতা উলটোই। দেখি যে, এই সব কেস-এর কোনও কোনওটা দারুণ মজার ব্যাপার। আবার দু-একটা খুবই দুঃখের ঘটনা। তবে মজাদার কাণ্ডই হোক আর দুঃখজনক ব্যাপারই হোক, সবগুলো ঘটনাই কোনও না কোনও ভাবে অ-সাধারণ, অদ্ভুত। এইসব ঘটনার একটাও ছিঁচকে চুরি, সাধারণ গুণ্ডামি বা রাহাজানির ব্যাপার নয়। তদন্ত করে কোনও রহস্যের সমাধান করাটা শার্লক হোমসের কাছে নিছক রুজিরোজগারের উপায় নয়। তাই শুধুমাত্র পয়সা উপার্জন করবার জন্যে যে-কোনও রকম 'কেস' নিতে সে মোটেই রাজি নয়। যে-সব 'কেস' একটু অন্য রকম, মানে যে-সব ঘটনা জীবনে বড় একটা চট করে ঘটে না, হোমস বেছে-বেছে সেই সব 'কেস'-ই নেয়। এই যে সব কেস-এর কথা বলছি, তার মধ্যে স্টোক মোরানে সারের বিখ্যাত রয়লট্ বংশের ব্যাপারটা বোধহয় সবচেয়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া জমজমাট কাণ্ড। হোমসের সঙ্গে আমার আলাপ হবার অল্প কিছুদিন পরেই এই ঘটনাটা ঘটে। তখন আমরা বেকার স্ট্রিটে থাকতুম। এই ঘটনার কথা আমি আগেই লিখতুম। কিন্তু লিখিনি, কেননা আমি একজন ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েছিলুম যে, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এ-কথা কারও কাছে প্রকাশ করব না। সেই ভদ্রমহিলা কিছুদিন আগে হঠাৎ মারা গেছেন। আর আমাকেও প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। আর একটা কারণেও ব্যাপারটা ঠিক কী হয়ে ছিল, তা পরিষ্কার করে বলা দরকার। কেননা ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে যে-সব গুজব আর গাল-গল্প ছড়াচ্ছে, তা আসল ঘটনার চাইতে ঢের বেশি মারাত্মক।

সেটা ১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাস। একদিন ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলতেই দেখি যে, জামা-কাপড় পরে বাইরে বেরোবার জন্যে 'রেডি' হয়ে শার্লক হোমস আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। হোমস সাধারণত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সবে সওয়া সাতটা বাজছে। হোমসের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালুম। নিজের ওপর একটু রাগও হল। আমি জীবনে মোটামুটিভাবে একটা 'রুটিন' মেনে চলি।

"ওয়াটসন, সাতসকালে তোমার ঘুম ভাঙালুম বলে খারাপ লাগছে। তবে কি জানো, আজ আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। মিসেস হাডসনকে কে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। তিনি তার শোধ তুলেছেন আমার ওপর। আর আমি তুললুম তোমার ওপর।"

"কিন্তু হয়েছেটা কী? আগুন-টাগুন লেগেছে নাকি?"

"না। এক মক্কেল এসে হাজির হয়েছেন। যতটুকু জানতে পেরেছি, তা হল এক কমবয়সী ভদ্রমহিলা খুব উত্তেজিত অবস্থায় এখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভীষণ জেদ ধরেছেন। তাঁকে বাইরের ঘরে বসানো হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে, যদি কমবয়সী কোনও ভদ্রমহিলা ভোরবেলায় লণ্ডন শহরে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় একা-একা ঘুরে বেড়ান আর কোনও অপরিচিত লোকের ঘরে জোর করে ঢুকে তাকে বিছানা থেকে ঘুম ভাঙিয়ে টেনে তোলেন, তো বুঝতে হবে ব্যাপার খুবই গুরুতর। আর ব্যাপারটা যদি সত্যি-সত্যি 'ইন্টারেস্টিং' হয় তো তুমি নিশ্চয়ই গোড়া থেকে সব কথা জানতে চাইবে। তাই ভাবলুম তোমাকে সব কিছু জানানো উচিত।"

"বন্ধু হে, এমন সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়ছি না।"

শার্লক হোমসের তদন্ত করবার কায়দা কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আমি যেরকম আনন্দ পাই, সেরকম আর কোনও কিছুতেই পাই না। আমার সব চাইতে ভাল লাগে তার বিশ্লেষণের পদ্ধতি। যখন সামান্য কোনও সূত্র থেকে সে কোনও সিদ্ধান্ত করে, তখন মনে হয় যে, ব্যাপারটা স্রেফ একটা 'ইনটুইশন'। কিন্তু তা নয়। ইনটুইশন নয়, তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত যুক্তির ওপর দাঁড় করানো। তার কাছে যে-সব সমস্যা এনে হাজির করা হয় এই চুলচেরা বিশ্লেষণের সাহায্যেই হোমস সেগুলোর নির্ভুলভাবে মীমাংসা করে দেয়। আমি কোনও রকমে চোখেমুখে জল দিয়ে, জামাকাপড় পরে নিতেই, হোমস আমাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গেল। আমরা ঘরে ঢুকতেই কালো কাপড়জামা পরা মুখে ওড়না চাপা দেওয়া এক ভদ্রমহিলা জানালার কাছের চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"গুডমর্নিং মাদাম। আমার নাম শার্লক হোমস। আর ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসন," অল্প হেসে হোমস বললে। "এঁর সামনে আপনি আপনার সব কথাই কোনও রকম সংকোচ না করে বলতে পারেন।...যাক্, মিসেস হাডসন দেখছি বুদ্ধি করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনি আগুনের কাছে সরে আসুন। আমি দেখি, একটু গরম কফির ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আপনি তো দেখছি ঠাণ্ডায় খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন।"

হোমসের কথায় ভদ্রমহিলা ফায়ার প্লেসের কাছে এসে বসলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, "আমি কাঁপছি দেখে আপনি ভাববেন না আমি ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়ছি।"

"তবে?"

"বিশ্বাস করুন মিঃ হোমস, আমি ঠাণ্ডায় এরকম কাঁপছি না। ওহ্, সাংঘাতিক বিভীষিকা।" এই কথা বলে ভদ্রমহিলা মুখের চাপাটা সরিয়ে দিলেন। দেখলুম ভদ্রমহিলার অবস্থা সত্যি খুবই শোচনীয়। দেখে কষ্ট হল। মুখ শুকিয়ে গেছে। মুখের রংটা কেমন বিশ্রীরকম সাদাটে হয়ে গেছে। চোখে একটা ভয়ের ছাপ। কী যেন বিপদের আশঙ্কায় চোখ দুটো সব

সময়েই এদিক-ওদিক ছটফট করছে। চেহারা দেখে মনে হল, ভদ্রমহিলার বয়স তিরিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু এরই মধ্যে চুলে পাক ধরেছে। তাঁর শরীরে একটা অসম্ভব হতাশা আর ক্লান্তির ছোপ পড়েছে। শার্লক হোমস খুব ভাল করে ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক দেখে নিলে।

তারপর ভদ্রমহিলার হাতে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "আপনি একদম ভয় পাবেন না। আমরা নিশ্চয়ই আপনার সমস্যার খুব তাড়াতাড়ি একটা সমাধান করে ফেলতে পারব।...আপনি সকালের ট্রেনে এসেছেন দেখছি।"

"আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

"না। তবে আপনার বাঁ হাতের দস্তানার ফাঁকে একটা রিটার্ন টিকিটের আধখানা গোঁজা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। আপনি খুব সকাল-সকাল বেরিয়েছেন। আরও দেখতে পাচ্ছি, টমটমে চেপে অনেকটা মেঠো রাস্তা পেরিয়ে আপনাকে স্টেশনে আসতে হয়েছে।"

ভদ্রমহিলা ভয়ানকরকম চমকে উঠলেন। তারপর আমার বন্ধুর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

"না, না, এর মধ্যে কোনও ম্যাজিক নেই," হাসতে হাসতে হোমস বললে। আপনার কোটের বাঁ হাতায় কম করে সাত জায়গায় কাদার ছিটে লেগেছে। দাগগুলো দেখতে পাচ্ছি টাটকা। টমটম ছাড়া আর কোনও গাড়ি থেকে এরকম কাদা ছিটোয় না। আর গাড়োয়ানের বাঁ দিকে বসলে এরকম কাদার ছিটে লাগবেই।"

"সে যে-ভাবেই আপনি কথাগুলো বলুন না, আপনার কথা সবই সত্যি," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি ছটা বাজার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ঠিক ছটা বেজে কুড়ি মিনিটে লেদারহেডে এসে পৌঁছেছি। তারপর সেখান থেকে প্রথম যে ট্রেন পেয়েছি, সেটায় চেপে ওয়াটারলু স্টেশনে এসেছি।...বিশ্বাস করুন, আমার মনের ওপর যে অসম্ভব চাপ পড়ছে, তা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব। আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে এই ঘোর বিপদের দিনে আমি একটু সাহায্য পেতে পারি। আমার কেউ নেই, কেউ নেই। আপনার কথা আমি শুনেছি মিঃ হোমস। মিসেস ফ্যারিন্টশ্ আমাকে আপনার কথা বলেছেন। মিসেস ফ্যারিন্টশ্‌কে আপনি বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারেন না? আর কিছু না হোক, যে কাণ্ড সব ঘটছে, সেগুলো অন্তত কেন বা কীভাবে ঘটেছে, আমাকে যদি বুঝিয়ে দেন? ঠিক এখুনি আমি আপনাকে আপনার ফি দিতে পারব না। তবে দু'এক মাসের মধ্যেই আমি আমার সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে যাব। তখন আমি আপনাকে আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক অবশ্যই দেব। সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ভদ্রমহিলার কথার কোনও জবাব না দিয়ে হোমস তার ডেস্কের কাছে গেল। তারপর ডেস্ক খুলে একটা ছোট নোটবই বের করে পাতা ওলটাতে লাগল।

"ফ্যারিন্টশ্," হোমস আপন মনে বললে, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন ঘটনাটা মনে পড়েছে। একটা গয়না নিয়ে গোলমাল হয়েছিল।... বুঝলে ওয়াটসন, ফ্যারিন্টশের ব্যাপারটা যখন তদন্ত করছিলুম, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি।" তারপর ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হোমস বললে, "আপনাকে শুধু এই কথা দিতে পারি যে, ফ্যারিন্টশের বেলায় যেরকম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলুম, আপনার বেলায়ও সেই রকম চেষ্টাই করব। আর পারিশ্রমিকের কথা বলছেন? কাজের আনন্দই আমার সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক। আর খরচপত্র যা হবে, তা আপনি আপনার যখন সুবিধে হবে তখনই দেবেন। এখন আপনি আমাকে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলুন, যাতে করে আমি আপনার সমস্যাটার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি।"

খুব একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আমাদের মক্কেল বলতে শুরু করলেন। "কিন্তু মুশকিলটা কী জানেন, আমার এই বিপদের আশঙ্কাটা অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। আর ব্যাপারটা ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না বলেই আমার ভয়টা আরও বেশি ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। আমার এই আশঙ্কার মূলে এমন সব ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার রয়েছে যে, কারও কাছে আমার মনের কথা খুলে বললেই সে মনে করে সবটাই মিথ্যে মেয়েলি কল্পনা। আমার মুখের ওপর এই কথা কেউ বলে না ঠিকই, তবে হাবেভাবে ঠারেঠোরে সেই কথাই জানিয়ে দেয়। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি যে, আপনি দুষ্টু লোকেদের সব শয়তানি মতলবই ধরে ফেলতে পারেন। হয়তো আপনি আমাকে বলে দিতে পারবেন যে, কী করে আমার চারপাশে বিপদের যে বেড়াজাল বিছিয়ে রয়েছে তা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারব।"

"আপনার কথা শোনবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

"আমার নাম হেলেন স্টোনার। আমি আমার বিপিতার, মানে আমার মায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কাছে থাকি। আমার বিপিতা এক খুব পুরনো স্যাক্সন বংশের সন্তান। সারের পশ্চিম অংশে স্টোক মোরান অঞ্চলে রয়লটদের খুব খাতির।"

হোমস মাথা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, ওদের কথা শুনেছি বটে।"

"রয়লটরা এক সময় খুবই অবস্থাপন্ন লোক ছিল। উত্তরে বার্কশায়ার থেকে পশ্চিমে হ্যামশায়ার পর্যন্ত এদের জমিদারি ছিল। গত একশো বছরে এদের বংশে পরপর বেশ কয়েকজন বেহিসেবি উড়নচণ্ডে ধরনের লোক জন্মায়। এরা টাকা আয় করার চাইতে টাকা ওড়াতেই বেশি পটু ছিল। এদের হাতে পড়ে জমিদারির অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। শেষকালে এমন একজন নচ্ছার স্বভাবের লোকের হাতে জমিদারির ভার এল, যে সে-সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। ফলে এমন হল যে, কয়েক একর জমি আর ওই দুশো বছরের পুরনো বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই রইল না। অবশ্য বসতবাড়িটাও এখন বন্ধক পড়েছে। আমার বিপিতার পিতা ছিলেন যেমন দাম্ভিক, তেমনি অত্যাচারী। কিন্তু আয় বলতে তাঁর একটি কানাকড়িও ছিল না। আমার বিপিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঁচতে হলে তাঁকে পয়সা উপায় করতেই হবে। তাই তিনি তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার করে ডাক্তারি পড়তে যান। ডাক্তারি পাশ করে তিনি প্র্যাক্‌টিস করতে কলকাতায় যান। সেখানে তাঁর চেষ্টায় আর যোগ্যতায় তিনি বেশ ভালরকম পসার জমিয়ে তোলেন। কলকাতায় একদিন তাঁর বাড়িতে একটা ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি হয়। সেই চুরির সঙ্গে তাঁর চাকরের যোগসাজস আছে মনে করে তিনি তাকে এমন বেধড়ক ঠ্যাঙানি দেন যে, বেচারা প্রাণে মারা পড়ে।

অল্পের জন্য তিনি ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যান বটে, তবে তাঁকে অনেক দিন হাজতবাস করতে হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে এই ঘটনার পরে তাঁর স্বভাব পালটে যায়। তাঁর মেজাজ ক্রমশ রুক্ষ হয়ে ওঠে।

"ভারতবর্ষে থাকবার সময় ডঃ রয়লটের সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। আমার মায়ের হাতে অনেক টাকাকড়ি ছিল। তিনি সেই টাকাকড়ি আমার আর আমার যমজ বোন জুলিয়ার মধ্যে উইল করে ভাগ করে দেন। উইলের শর্ত হল যে, যতদিন না আমাদের বিয়ে হচ্ছে, ততদিন আমাদের বিপিতাই আমাদের সম্পত্তির দেখাশোনা করবেন। বিয়ের পর আমরা নিজের নিজের ভাগ পেয়ে যাব। ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসবার অল্প কিছু দিন পরে ক্রু স্টেশনের কাছে এক দুর্ঘটনায় আমাদের মা মারা যান। এই ঘটনার পরই আমাদের বিপিতা লণ্ডন শহরের বাস তুলে দিয়ে আমাদের নিয়ে স্টোক মোরানের বাড়িতে চলে যান। আমাদের মায়ের যে টাকা-পয়সা ছিল তাতেই আমাদের খুব ভালভাবে চলে যেত।

"আমাদের মায়ের মৃত্যুর পরে আমাদের বিপাতার স্বভাব হঠাৎ খুব পালটে যেতে শুরু করলে। আমরা স্টোক মোরানে ফিরে যাওয়ায় ওখানকার বাসিন্দেরা খুবই খুশি হন। তাঁদের খুশি হবার কারণ এই যে, অনেক দিন পর একজন রয়লট বংশের লোক আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমাদের বিপিতা স্থানীয় অধিবাসীদের এই মনোভাব মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। তিনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন না। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে বচসা ছাড়া তিনি বাক্যালাপ করেন না। রয়লট বংশের লোকেরা এমনিতেই রাগী বলে কুখ্যাত। কিন্তু আমার বিপিতার বেলায় এই বদমেজাজ আর রাগ প্রায় পাগলামিতে ঠেকেছে। আমার নিজের মনে হয়, অনেকদিন গরম দেশে কাটানোর ফলেই তাঁর স্বভাব এমন হয়ে গেছে। স্টোক মোরানের অধিবাসীদের সঙ্গে ওঁর ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। দু'চার বার তো ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে যে, পুলিশ পর্যন্ত এসেছে। এর ফলে এখন এমন হয়েছে, গ্রামের লোকেরা তাঁকে রীতিমত ভয় করে। তাঁকে আসতে দেখলেই পালাতে থাকে। একে তো ডঃ রয়লট দারুণ বদমেজাজি, তার ওপরে তাঁর গায়ের জোরও অসম্ভব।

"গত সপ্তাহে উনি একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে বাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। আমার হাতে যা টাকা পয়সা ছিল, সব তাকে দিয়ে কোনও রকমে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিই। গ্রামের লোকেদের কানে কথাটা গেলে খুব মুশকিল হত। ওঁর এমনি কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। তবে বেদেদের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব। আমাদের ওদিকে বেদের দল প্রায়ই আসে। বেদের দল এলে তিনি তাদের আমাদের বাগানে থাকতে দেন। উনি অনেক সময় ওদের তাঁবুতে থাকেন। আবার কখনও কখনও কাউকে কিছু না জানিয়ে ওদের সঙ্গে কোথায় চলে যান। ওঁর খুব জীবজন্তু পোষার শখ। তবে সাধারণ জীবজন্তু নয়, ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা অদ্ভুত সব জন্তু। আমাদের বাড়িতে একটা চিতা আর একটা বেবুন আছে। ওগুলো সব সময়ে বাগানে ছাড়া থাকে। ওই অঞ্চলের লোকেরা আমাদের বিপিতা আর ওঁর পোষা জন্তুদের মধ্যে কাকে বেশি ভয় করে বলা শক্ত।

"আমার কথা থেকে বুঝতে পারছেন যে, আমার আর আমার বোন জুলিয়ার জীবন কী-রকম। আমাদের জীবনে কোনও আনন্দ, কোনও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের বাড়িতে চাকর-বাকর টেঁকে না। সংসারের বেশির ভাগ কাজই নিজেদের করে নিতে হয়। জুলিয়া যখন মারা যায়, তখন তার বয়স তিরিশও হয়নি। অথচ তার মাথার সব চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল।"

"আপনার বোন কি মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, ঠিক দু'বছর আগে সে মারা যায়। তার মৃত্যুর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি বুঝেছেন নিশ্চয় যে, আমরা কী-রকম বন্দীর মতো থাকি। বাইরের কারও সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ আমাদের নেই। হ্যারোতে আমাদের এক মাসি থাকেন। আমাদের মায়ের আপন বোন। বিয়ে-থা করেননি। নাম মিস্ হনোরিয়া ওয়েস্টফেল। আমরা ন'মাসে ছ'মাসে মাসির বাড়ি বেড়াতে যাই। বছর দুয়েক আগে বড়দিনের সময় আমরা মাসির বাড়িতে ছিলুম। তখন আমার মাসি জুলিয়ার সঙ্গে ওই অঞ্চলের বাসিন্দে এক নৌসেনাবাহিনীর মেজরের বিয়ের সম্বন্ধ করেন। জুলিয়াকে ভদ্রলোকের বেশ পছন্দ হয়েছিল। আমাদেরও ভদ্রলোককে ভাল লেগেছিল।

"মাসির বাড়ি থেকে ফিরে আমি আমাদের বিপিতাকে সব খুলে বলি। তিনি সব কথা শুনে বেশ খুশি হয়েই এই বিয়েতে মত দেন। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগে এমন এক দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে আমি আমার বোন, আমার একমাত্র নিজের লোককে চিরকালের জন্যে হারাই।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রীম ক্রাঞ্চ ফাঁস করছে

Bakeman'S
Home Baked Freshness

এক 'গোপন কাহিনী'

রসিয়ে রসিয়ে ক্রীম ক্রাঞ্চ বিস্কুট খাবার রহস্য ।

১ আশেপাশে কেউ নেই তো ? ভাল করে দেখে নিন
২ প্যাকেট থেকে সযত্নে একটা বিস্কুট বার করুন
৩ ধীরে ধীরে ওটাকে খুলে ফেলুন
৪ ভেতরের ক্রীমটুকু চাটতে থাকুন
৫ ক্রীমটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া নং ৪ চালিয়ে যান
৬ মচ্‌মচে বিস্কুট গুলোয় এবার কামড় লাগান
৭ সাবধান ! ক্রীমে ভরপুর বিস্কুটের একটা টুকড়োও যেন পড়ে না থাকে

বাটার ক্রীম

ইলাচী ক্রীম

বেকম্যানের ক্রীম ক্রাঞ্চ

সত্যি – এর শেষ টুকড়োটা পর্যন্ত শুধু ক্রীম, ক্রীম আর ক্রীম

কেবল বিশেষ কতগুলি সহরে পাওয়া যাচ্ছে ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব ছৈ ছৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

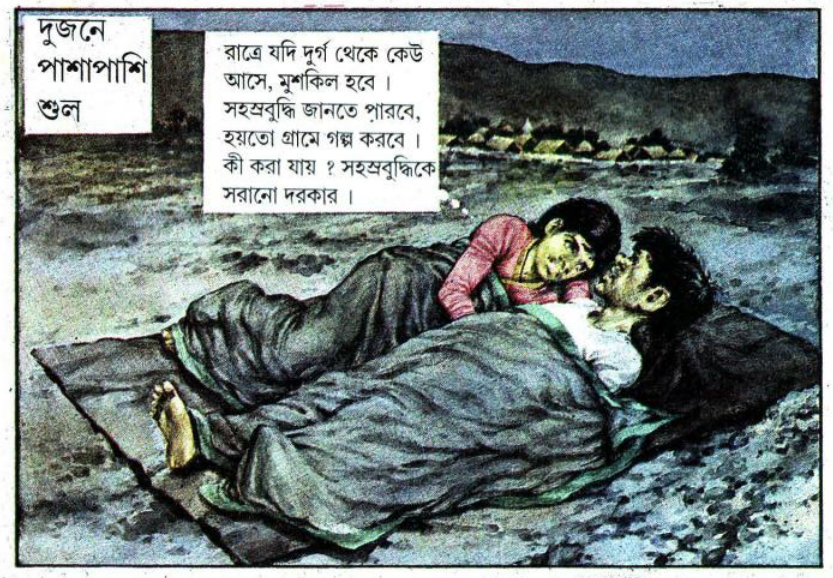

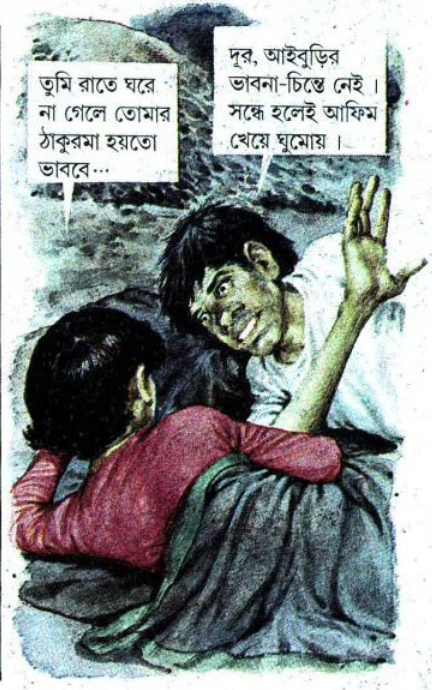

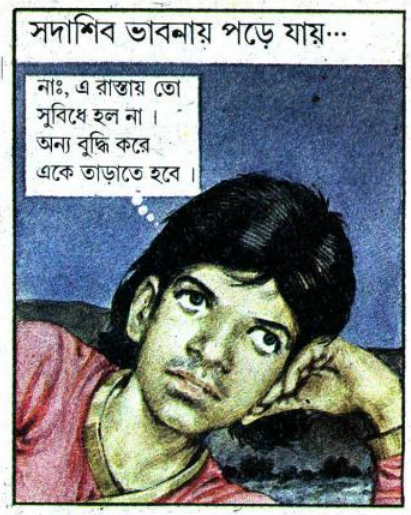

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

যুদ্ধ

রাজ্যে লাগল যুদ্ধ,
রাজামশাই ক্রুদ্ধ ।
মন্ত্রী বলেন রাজামশাই,
জেতবার কোন আশা যে নাই
সেনাপতি ভেবে মরে,
জিততে হবে যাহোক করে ।
সৈনিকেরা যুদ্ধ করে,
ঘোড়ার পিঠের ওপর চড়ে ।
এমন সময় খবর এল
রাজা গেছেন হেরে,
প্রজারা সব পালায় ভয়ে
আপন রাজ্য ছেড়ে ।

বিপুল সাহা (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে **সুব্রত সান্যাল** (বয়স ১৩)

আমি প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি

গত ৩০ অক্টোবর দুপুরবেলা হঠাৎ শুনলাম আমাদের বাড়ির কাছেই খড়্গপুরে রাজীব গান্ধী আসবেন । বিকেল ৪টে থেকে আমি গিয়ে মঞ্চের কাছে বসে আছি, রাজীব গান্ধীকে দেখব বলে । ভাবলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধীকে তো কোনওদিন দেখিনি, তাঁর ছেলেকে একটু দেখব । কিন্তু, বিকেল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত বসে থেকেও তাঁর দেখা পেলাম না । তিনি তখনও পর্যন্ত আমাদের আই· আই· টি· ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছননি । সন্ধে হয়ে গেল দেখে বাড়ি ফিরে এলাম ।

রাত আটটা নাগাদ ঘর থেকেই হঠাৎ শুনি খুব চিৎকার, 'রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ,' 'রাজীব গান্ধী জিন্দাবাদ' । আমি সঙ্গে-সঙ্গে আমার সাইকেল নিয়ে ছুটে যাই রাস্তায় । আমি পৌঁছবার আগেই উনি বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে পড়েছেন । আমি একদম সামনে গিয়ে ভাল করে দেখলাম । উনি তখন গাড়িতে উঠে পড়েছেন, এবং খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চলছে ।

আমরা কাছে থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজীব গান্ধীকে দেখলাম এবং হাত নাড়লাম । আমার মনে হল উনি যেন ঠিক আমার দিকে তাকিয়েই হাত নাড়লেন ।

কিন্তু পরদিনই যখন শুনলাম, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মারা গেছেন, তখন খুব খারাপ লাগল । খালি মনে পড়ছিল আগের দিনের দেখা রাজীবের হাসি-হাসি মুখ, মায়ের মৃত্যুতে আজ আর মুখে সেই হাসি নেই । তারপর যখন শুনলাম, রাজীব গান্ধী আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হল । ভাবলাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার !

ধ্রুবশঙ্কর দে (বয়স ১০)

পায়ের জোরে

এক জোড়া পা আছে বলেই
ফুটবলটা খেলতে পারি ।
বন্ধ হওয়া মোটর গাড়ি
পেছন থেকে ঠেলতে পারি ।
পা আছে তাই প্যাডেল করে
সাইকেলেতে চড়তে পারি ।
ট্রাম-বাসটা ফসকে গেলেও
অনায়াসেই ধরতে পারি ।

চন্দনকুমার দে (বয়স ১৬)

ভূত বলল, "তুমি আমায় হাইকোর্ট দেখাচ্ছ ?"

শিবুখুড়োর দুধেলা গাই

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবুখুড়ো বললেন, "ভূত হল গিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে নির্বোধ চিজ। ওদের বুদ্ধির দৌড় আমার জানা আছে।"

হয়েছে কী, এবার মণিকা তার জন্মদিনে একটা বই উপহার পেয়েছে, তাতে আছে ক'টা ভূতের গল্প। সেই সব ভূত ভারী করিৎকর্মা। লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে নাস্তানাবুদ করে। তারই সব ভয়ঙ্কর কাহিনী নিয়ে বইটা।

সন্ধেবেলা মণিকা বসে বইটা পড়ছিল। আমরা শুনছিলাম। শুনতে শুনতে বেশ গা-ছমছম করছিল।

শিবুখুড়ো কখন ঘরে ঢুকেছেন টের পাইনি। চমক ভাঙল তাঁর মন্তব্য শুনে।

দিন কয়েক হল শিবুখুড়ো আমাদের বাড়িতে এসেই রয়েছেন। উনি মাঝেমধ্যেই ধূমকেতুর মতো আসেন, এবং কয়েকটা দিন কাটিয়ে হঠাৎ চলে যান। আমাদের এই সর্বজনীন খুড়োমশাইটির জন্য আমাদের বাড়ির দরজা সব সময়ই খোলা। উনি থাকলে সময়টা আমাদের ভালই কাটে, কারণ শিবুখুড়োর ঝুলিতে আছে হরেক গল্পের মালমশলা। উনি অবশ্য বলেন, ওগুলো নিছক গল্প নয়, ওঁর বিচিত্র জীবনের এক-একটা ঘটনা। আমরাও সন্দেহ প্রকাশ করে গল্প শোনার আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চাই না।

তাই শিবুখুড়ো যখন হঠাৎ আমাদের আসরে ঢুকে এমন একটা মন্তব্য করলেন, আমরা একেবারে লাফিয়ে উঠলাম।

খুড়োকে উশকে দিতেই পাঁচু বলল, "ভূতের বুদ্ধির দৌড় আপনি কী করে জানবেন খুড়ো ? হাতেনাতে কখনও প্রমাণ পেয়েছেন ?"

উত্তরে শিবুখুড়ো তাঁর হাতের থেলো-হুঁকোয় লম্বা একটা টান দিয়ে প্রথমে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। শিবুখুড়োর মতোই ওঁর ওই কেলে থেলো-হুঁকোটার বয়সের হিসেব করার সাধ্যিও বোধহয় কারও নেই।

খানিকটা চুপচাপ, তারপর শিবুখুড়োই বললেন, "বছর বিশেক আগে যে-গ্রামে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেখানকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করলে এখনও সাক্ষ্য দেবে।"

গল্পের গন্ধ ততক্ষণে আমরা পেয়ে গেছি। এ-গল্প মণিকার পাওয়া উপহারের বইয়ের সাজানো গল্প নয়, শিবুখুড়োর চট্‌জলদি—যাকে বলে হাতে-গরম গল্প। সুতরাং সকলেই একসঙ্গে হৈহৈ করে উঠলাম।

শিবুখুড়ো বললেন, "শোনাতে পারি। তবে শর্ত আগের মতোই রইল। গল্পের মধ্যে অকারণে বাধা দেওয়া চলবে না।"

সবাই রাজি। শিবুখুড়ো শুরু করলেন।

সে-সময় কিছুদিন যাবৎ এক গাঁয়ে গিয়ে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করছি। তখন তো গাঁয়ে এত ডাক্তার-বদ্যি ছিল না। অতএব ডাক্তার হিসেবে খাতির-প্রতিপত্তি পেতে দেরি হয়নি।

সেবার গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল। প্রতিদিন মানুষ মরছিল,

সেইসঙ্গে বাড়ছিল ভূতের সংখ্যাও। আর রোগে ভুগে যারা কোনওক্রমে বেঁচেও উঠছিল, তাদের চেহারা দেখে ভূত কি মানুষ বোঝার উপায় ছিল না।

এমনই একদিন পাশের গাঁয়ে রুগি দেখে ঘরে ফিরছি। হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স ছাড়া অন্য কিছু নেই।

ফেরার পথে একটা মাঠ পার হতে হয়। বিরাট মাঠ। জনমানবহীন ধুধু। মাঝে মাঝে শুধু দু'চারটে গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

মাঠের মধ্যেই সন্ধে উতরে গেল।

মাঠটার বেশ বদনাম শুনেছি। সময়টাও কৃষ্ণপক্ষ। ভূত-প্রেতের পক্ষে আদর্শ সময়। তার ওপর তখন তো ভূতেদেরই মরসুম চলছে। কিন্তু অত ভাবার সময় নেই। আমি বেশ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফিরছিলাম। কে জানে, ঘরে গিয়ে হয়তো দেখব জনকয়েক রুগির বাড়ির লোক বসে অপেক্ষা করছে।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠটার প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছি। সেখানে একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ। হঠাৎ চোখে পড়ল, নিমগাছটার নীচে কে একজন বসে রয়েছে। কালো ডিগডিগে চেহারা, মাথাটা বড়, হাত-পা'গুলো যেন সরু কাঠি।

চেহারা দেখেই মনে হল, সদ্য অসুখ থেকে উঠেছে। তাই অমন ভূতের মতো চেহারা। হয়তো ঘরের অন্য কেউ আবার পড়েছে। আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে কি না কে জানে, পথের মধ্যে থেকেই টেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

গলা ঝাড়া দিয়ে বললাম, "কে রে ?"

ও মা ! সঙ্গে-সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি একটা ভূত গো। তুমি কে ?"

আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। একেবারে কিনা ভূতের সঙ্গে ফেস্-টু-ফেস্ ! আমার মতো মানুষের পর্যন্ত গা ছমছম করে উঠল। এখন উপায় ? তবে এটুকু সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে নিলাম, আমায় যদি ও মানুষ বলে জানতে পারে, তবে আর রেহাই নেই।

এদিকে আমার ইতস্তত ভাব দেখে ভূত খ্যানখেনে গলায় ধমকে উঠল, "কী, কথা বলছ না যে ?"

যা থাকে কপালে, দুম করে বলে দিলাম, "আমিও ভূত গো।"

মনে হল একটা ফাঁড়া কাটল। আমার চেহারা দেখে ভূত বাবাজীবন খুব একটা অবিশ্বাস করল মনে হল না।

বলতে বলতে শিবুখুড়ো একটু থেমে একচিলতে মিচকে হেসে বললেন, "তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, চেহারাটা আমার বরাবরই একটু 'ইয়ে' টাইপের, তার ওপর কিছুদিন যাবৎই খাওয়া-দাওয়ার সময় আমার নেই, রুগির পরিচর্যা করতে করতে শরীরের হাল আরও 'ইয়ে' হয়ে গেছে। ভূত বোধহয় সেই কারণেই স্বজাতি হিসেবে তখনকার মতো আমায় অবিশ্বাস করল না। তার ওপর এমনিতেই বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। যে-কোনও জ্যান্ত মানুষকেও এ-সময় ভূতের মতো মনে হয়, আর আমার গায়ের রঙটা তো এমনিতেই ইয়ে..."

পাঁচু বলল, "আঃ খুড়ো, 'ইয়ে' কথাটা আপনি বড্ড ব্যবহার করছেন। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, তারপর কী হল, তাই বলুন।"

"ঠিক বলেছিস। কাহিনীতেই ফিরে যাই।" শিবুখুড়ো গল্পের খেই ধরলেন :

ভূত আমার উত্তর শুনে বলল, "ভালই হল, পথে একটা সঙ্গী পাওয়া গেল। চলো, একটু গ্রামের দিকে যেতে হবে। গত হপ্তায় কালু পোড়েল সপরিবারে ভূতলোকে এসেছে। আজ ওর অভিষেক হবে। এ এলাকার ভূত-সর্দার ছাড়াও অনেক গণ্যমান্য ভূত আসবে। শুনেছি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ঢালাও হবে।" বলতে বলতে খ্যানখেনে গলায় হেসে উঠল ভূত। তারপর বলল, "তাই আমিও চলেছি ভিন গাঁ থেকে। তুমিও বুঝি তাই ?"

মনে মনে ভাবলুম, ভিন গাঁয়ের ভূত বলেই আমায় চিনতে পারেনি। মুখে বললুম, "হুঁ।"

দুজনে হাঁটতে শুরু করেছি। কিন্তু ভূতের সঙ্গে হাঁটতে পারা কি সোজা কথা। হাঁটছে না তো, যেন উড়ে চলেছে। আমি তো বারবার কেবল হোঁচট খাচ্ছি, আর পিছিয়ে পড়ছি।

"কী গো, এত আস্তে হাঁটছ কেন," বলতে বলতে এক সময় ভূত এসে আমার হাত ধরেই চমকে উঠল। বলল, "এ কী ! তোমার হাত এত গরম কেন ? ভূতের হাত তো এমন হয় না।"

একে তো ভূতের হাতের কনকনে স্পর্শে আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে গেছে, তার ওপর ওর কথায় মনের ভেতরেও কাঁপুনি অনুভব করলাম। কিন্তু জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, "ইয়ে, মানে সবেমাত্তর ভূত হয়েছি তো।"

"কী জানি বাপু," ভূত আমার হাত ছেড়ে নিজের মনে গজগজ করতে শুরু করল। "ভূতের হাত এমন মানুষের মতো গরম হয়, এ তো কখনও শুনিনি। তোমার গা থেকেও কেমন যেন 'মানুষ-মানুষ গন্ধ' পাচ্ছি বটে !"

এই মুহূর্তে ভয় পাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অতএব যে-কোনও উপায়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। বললাম, "মরে ভূত হয়ে গা থেকে মানুষের গন্ধ মুছতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। আর এইজন্যেই তো চলেছি কালু পোড়েলের অভিষেকে। ভূত সর্দারকে বলে এই সঙ্গে নিজের অভিষেকটাও সেরে নেব। তাহলে এই মানুষ-মানুষ গন্ধটা আর থাকবে না।"

আমার যুক্তিতে ভূত খুব একটা খুশি হয়েছে মনে হল না। গজগজ করেই চলল।

এদিকে আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। মুখে যে-ভাবই দেখাই, চলতে চলতে হাঁটুর কাঁপুনি নিজেই টের পাচ্ছি। সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরছে কুলকুল করে।

এক সময় ভূত একেবারে পাশে এসে পড়তেই টপ্ করে একফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল ওর গায়ের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে যেন আঁতকে উঠল শ্রীমান ভূত। বলল, "কিসের জল পড়ল বলো তো। আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয়।"

অস্ফুট গলায় বললাম, "শিশির-টিশির হবে।"

ভূত চিড়বিড়িয়ে উঠে বলল, "তুমি কি আমায় হাইকোর্ট দেখাচ্ছ ? এ সময় কখনও আকাশ থেকে শিশির পড়ে ?" বলতে বলতে আমাকে ভালভাবে লক্ষ করে বলল, "নাঃ, আমার তো মনে হচ্ছে তোমারই ঘাম ঝরেছে। না, বাপু, আমার রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে তুমি আসল ভূত কি না।"

কী সর্বনাশ ! এবার তো গেছি। আমি অবশ্য কাষ্ঠহাসি

হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভূতের খুঁতখুঁতুনি গেল না। বারবার এক কথাই বলে চলল, আর আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল।

এ তো মহাবিপদ! এ অবস্থায় কী যে করি, কিছুই ভাবতে পারছি না। হঠাৎ ভূতই আমার চিন্তার খেই ধরিয়ে দিল। বলল, "বাপু, তুমি যে আসল ভূত, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারো?"

বললাম, "কী প্রমাণ চাও?" তারপর ভূত কিছু বলার আগেই বললাম, "আমরা ভূতেরা তো ইচ্ছেমতো আকার নিতে পারি, সে-ব্যাপারেই পরীক্ষা হোক।"

ভূত বলল, "ঠিক ঠিক, তাতেই বোঝা যাবে তুমি আসল ভূত কি না। নাও, আকার বদলে একটা কুকুরছানা হও দেখি।"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "উঁহু, সেটি হচ্ছে না। আগে প্রমাণ দিতে হবে তুমি নিজেই ভূত কি না।"

"তার মানে?" ভূত তো এবার রীতিমত অবাক। "আমার ক্ষেত্রে প্রমাণের দরকার কী?"

"দরকার আছে হে," আমি বললাম, "ব্যাপারটা তো অন্যরকমও হতে পারে। মানে আসলে হয়তো তুমি নিজেই ভূত নও, তাই ভূতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই সব ফন্দি-ফিকির করছ।"

শিবুখুড়োর গল্প এখন একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছে। তিনি একটু থামতেই পাঁচু বলল, "ভূত আপনার কথা শুনে কী বলল খুড়ো?"

"ভূত তো প্রথমটা কিছুক্ষণ থম্ মেরে রইল। তারপর খ্যানখেনে গলায় খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, 'বেশ বেশ, এখন বলো আমায় কী হতে হবে। কিন্তু তারপরই তোমার পালা, মনে রেখো।'

"সে তো বটেই," আমি বললাম, "পরীক্ষা দুজনেরই হবে। তাতেই প্রমাণ হবে কে ভূত। তুমি বরং এক্ষুনি একটা নধর দুধেলা গাই হয়ে যাও।"

আসর গরম। পাঁচু বলল, "ভূত কখনও গাই হতে পারে?"

শিবুখুড়ো বললেন, "আলবত পারে। আসল ভূত পারে না কী?" শিবুখুড়ো বললেন, "এক পলকের মধ্যে তাকিয়ে দেখি, সামনে একটা কালো রঙের নধর দুধেলা গাই দাঁড়িয়ে শিং নাড়ছে।"

"বলেন কী খুড়ো!" আমরা সবাই কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। তারপর পাঁচু বলল, "আপনি চোখের সামনে দেখলেন ভূতটা মুহূর্তের মধ্যে একটা দুধেলা গাই হয়ে গেল? তারপর আপনি কী করলেন?"

"যা করবার তাই করলাম," খুব স্বাভাবিকভাবেই শিবুখুড়ো থেলো-হুঁকোটা ফের মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, "ততক্ষণে বাড়ির তো প্রায় কাছাকাছিই চলে এসেছিলাম। হাঁকডাক করে লোকজন ডেকে গাইয়ের গলায় দড়ি পরিয়ে বাড়ির গোয়ালে ঢুকিয়ে দিলাম।"

কিছুক্ষণ আমাদের কারও মুখেই কোনও কথা সরল না। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না দেখে শিবুখুড়ো নিজেই থেলো-হুঁকোয় ভুড়ুক-ভুড়ুক করে গোটা-কয়েক টান মেরে বললেন, "ব্যাপারটা অন্য কারুর বিশ্বাস না হবারই কথা। অনেকেই তো জানে না আমার ঠাকুমা কতবড় গুনিন্ ছিলেন। শুনেছি দিনদুপুরে ভূত নামিয়ে তাদের দিয়ে সংসারের ফাইফরমাস খাটাতেন। তাঁর কাছেই শিখেছিলাম—তিনবার রামনাম করে ভূতের গায়ে ফুঁ দিলেই ভূত আর রূপ বদলাতে পারে না।"

আমরা আর বলব কী। যুক্তি-তক্কোগুলো মাথার মধ্যে তখন একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে। এ-অবস্থায় কিছুটা সময় কাটার পর মণিকাই বলল, "তা খুড়ো, সেই দুধেলা গাই কত বছর আপনার গোয়ালে ছিল?"

"তা বছর তিনেক তো বটেই। প্রতিদিন দশ সের করে খাঁটি দুধ দিত। সেই দুধ নিজেরা খেয়েও সারা পাড়ার লোককে বিলিয়েছি। তবে হ্যাঁ, গাইটা আমায় একেবারেই সহ্য করতে পারত না। কাছে গেলেই শিং বাগিয়ে তেড়ে আসত। তারপর একদিন রাত্তিরবেলা গোয়ালের দড়ি ছিঁড়ে সেই যে নিরুদ্দেশ হল, আর ফেরেনি। আমিও আর খোঁজ করিনি। বোধহয় মন্ত্রের জোর ততদিনে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

গল্প শেষ করে শিবুখুড়ো বললেন, "তাই বলছিলাম রে, মানুষের বুদ্ধির কাছে ভূত কোনও দিন দাঁড়াতে পারে না। আরে বাবা, মৃত্যুর পর দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মগজটাও তো ফেলে যেতে হয়।"

জবাব দেবার মতো অবস্থা আমাদের আর ছিল না। তবে মণিকার উপহার পাওয়া ভূতের লোমহর্ষক কেরামতির গল্প সেদিন আর জমেনি।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

একটা অস্ফুট গোঙানি শোনা গেল

মাল্টিপারপাস মামা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

লোকটাকে দেখে বেশ একটু ভয়ই পেল পিণ্টু। বাবা তখন বাড়িতে নেই। মা রান্নাঘরে। গ্রিলঘেরা বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল পিণ্টু। লোকটা গলির মধ্যে ঢুকে একটু ইতস্তত করল। একবার পাশের বাড়ির সামনে দাঁড়াল, কাকে যেন কী জিজ্ঞেস করল। তারপর পিণ্টুর দিকে চেয়ে একটু যেন হাসল। ওকে মোটেই চেনা মনে হল না। পিণ্টু চোখ ফিরিয়ে নিল। একটু পরেই দেখল লোকটা সোজা একেবারে বাড়ির মধ্যে চলে এসেছে। বিশাল দশাসই চেহারা। ডিসেম্বরের শীতে বোধহয় চানও করেনি কয়েকদিন। হাতে-পায়ে খড়ি উঠছে। একমাথা চুল, উলিঝুলি ; বেশির ভাগই সাদা। মুখে তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ। গায়ে একটা ডোরাকাটা হালকা কম্বল জড়ানো। কম্বল গায়ে দিয়ে এ-শহরে কাউকে রাস্তায় বেরুতে দেখেনি পিণ্টু। কাঁধে আবার একটা ঢাউস ঝোলা ব্যাগ। পায়ে জুতো না থাকলে মনে হত সাধু-সন্ন্যাসী। বাবা-মার সঙ্গে হরিদ্বার বেড়াতে গিয়ে পিণ্টু এরকম লোক দেখেছে কনখলে। পিণ্টু ভাবল এই বুঝি লোকটা কনখলের সাধুদের মতো হাঁকার পাড়ে, বেটা তু তো মহা ভাগ্‌ইঅশালি হো বেটা। ভয়ে পিণ্টু বলল, "বাড়িতে কেউ নেই।"

আগন্তুক খরখরে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "তুই তো আছিস।" যাক্ লোকটা বাঙালি তাহলে। মৃদু হেসে শান্ত গলায় আবার বলল, "কী রে, দিদিকে দেখছি না ? ডাক।"

পিণ্টু গিয়ে মাকে ডেকে আনল। মা এসে দেখলেন বড় ঘরে আগন্তুক ততক্ষণে বেশ গুছিয়ে বসেছে। পিণ্টু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝল মা-ও চিনতে পারেননি। কেমন বিব্রত ও আড়ষ্ট দেখাল মাকে। দিদি-দিদি করছে লোকটা, অথচ মা তাকে চিনতে পারছেন না। মা-ও বোধহয় একটু ভয় পেয়েছেন। পিণ্টু একবার আগন্তুককে দেখছে, একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। মায়ের নজর আগন্তুকের ঝোলা-ব্যাগের দিকে। ওর মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নেই তো ? হঠাৎ যদি ওর ভেতর থেকে পিস্তল বের করে বাগিয়ে ধরে ? এরকম তো আকছার শোনা যায় আজকাল। ওদের ভয় পাইয়ে দিয়ে লোকটা যেন খুব মজা পাচ্ছে। মিটিমিটি হাসছে। ব্যাপারটাকে নাটকীয় করবার জন্য হঠাৎ মুখটা গম্ভীর করল, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পিণ্টুর দিকে। পিণ্টু একটু একটু করে ওর মায়ের কাছে সরে যাচ্ছিল, খপ্ করে ধরে ফেলে ওকে কোলে তুলে নিল। মায়ের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল নিশ্চয়ই, তাই দেখে লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, "ছেলেধরা নই দিদি ; ভয় নেই।"

সস্নেহে পিণ্টুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঘসে দিয়ে আদর করে বলল, "তোর মুখ তো একেবারে ফেলু জ্যাঠামশাইয়ের মতো হয়েছে রে।" ফেলু মায়ের বাবার ডাকনাম। ওই একটা শব্দে মায়ের মন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পিছনে উধাও হয়ে গেল। অবাক হয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। বাপের বাড়ির তরফে ঠিক কে হতে পারে লোকটা। পিণ্টু হিসেব করল, মায়ের বাবাকে জ্যাঠামশাই বলছে, তাহলে মায়ের ভাই, পিণ্টুর মামা হবেন সম্পর্কে। আবার হা-হা করে হাসলেন। বললেন, "চিনতে পারলে না তো দিদি ? আমি ধুলগাওয়ের ঘেঁটু। নিয়োগীবাড়ির উত্তরের ভিটের।"

চকিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিণ্টুর মায়ের। দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ভীষণ খুশি-খুশি দেখাল। বলল, "ওমা, ঘেঁটুদা ! এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ?"

তারপর নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "আমাকে দিদি-দিদি করছিলে কেন ? আমি তোমার থেকে কত্তো ছোট ! সেই জন্যেই তো চিনতে পারছিলাম না।"

পিণ্টুকে আলগোছে কোল থেকে নাবিয়ে মামা বললেন, "তাই বুঝি ?" কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, "কতদিন পরে দেখা ! তা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হল, না ? খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, এই শরিকের ওই শরিকের এমনি করে দেশের বাড়িতে কতগুলো ভাইবোন ছিলাম বলো তো আমরা ?"

মা বললেন, "কমলা, শান্তি, কুসুম। পুবের ভিটের জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে, কী নাম যেন ? সেই যে তোমাদের সঙ্গে হাডুডু খেলত ?"

মামা বললেন, "গোবিন্দের দিদি তো ? বসন। প্রায় সব্বাইকে খুঁজে বের করেছি। কে বড়, কে ছোট, কে দিদি, কে বোন—এত মনে থাকে ? দুম করে চিমটি বলে ডেকে ফেলে বিপদে পড়ি আর কি। তার চেয়ে দিদিটাই সেফ।"

পিণ্টুর মার ছেলেবেলার নাম চিমটি। মায়েদের এমনিতে কোনও নাম থাকে না, মায়ের নাম মা-ই। পাড়ার বৌয়েরা বলে পিণ্টুর মা। চিমটি নাম শুনে ভারী মজা পেল পিণ্টু। ও-নামে মাকে কেউ কোনওদিন ডেকেছে, মনে পড়ল না ওর। চিমটি চিমটি করে হেঁকে-ডেকে নামটা আবার চালু করে দিলেন মামা।

সেই থেকেই ঘেঁটুমামা এ-বাড়ির আপনজন হয়ে গেলেন। প্রতিবার পিণ্টুর ইস্কুলের ক্লাসে ওঠার পরীক্ষা হয়ে গেলেই মামা আসবেন। নতুন ক্লাসে ওঠার আগের ছুটির দিনগুলো ভরিয়ে দেবেন নানা আনন্দে। প্রথমবার এসেই একেবারে জাদু করে ফেললেন পিণ্টুকে। পিণ্টুর দাদা পড়ছে খড়্গপুরে, আই-আই-টিতে, দিদি আছে শান্তিনিকেতনে। বাড়িতে পিণ্টু একা।

মা-বাবা সব সময় আগলে আগলে রাখেন। সাইকেল শেখা হয়নি। মা বলেন, "শিখতে গেলেই পড়ে হাত-পা ভাঙবে।"

মামা বললেন, "ঠিকই তো বলে।"

পিণ্টু বলল, "বা রে ! তাই বলে সাইকেল শিখব না ?"

মামা বললেন, "কে বললে শিখবি না ? মায়েদের ভালবাসার কথাও শুনতে হবে, আবার সাইকেল চড়াও শিখতে হবে।"

কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, "তুই কিচ্ছু ভাবিস না, আমি তোকে শিখিয়ে দেব। ওর মধ্যে আছেটা কী ! সাইকেল চড়া শিখতে একদিন, জাস্ট একদিন।" এমন অনায়াসে বললেন যে, বিশ্বাস না করে পারল না পিণ্টু। ঘেঁটুমামা জানেন না এমন জিনিস নেই, পারেন না এমন কাজ নেই। পিণ্টু বলল, "তাহলে কবে শেখাবে ?"

"চুপ কর," মামা ফিসফিস করে বললেন, "চিমটি শুনতে পেলে বাগড়া দেবে।"

একমাস ছিলেন মামা। ওই একমাসে পুরোপুরি বড় করে দিয়ে গেছেন পিণ্টুকে। রোজ মামা ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। আরও সব ভাগ্নেদের গল্প করতেন। বলতেন, তোরা সবাই দেখছি লেখাপড়ায় বেশ ভাল, কিন্তু অনেক কিছুই জানিস না। তোদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন লাগিয়ে দেব ভাবছি। ঘরে-বাইরে, ইস্কুলে-মাঠে-বাগানে-পুকুরে, সমান চৌখস হতে হবে। যে হবে তাকে একটা দারুণ প্রাইজ দেব।

একদিন সাইকেলের দোকান থেকে ঘণ্টা হিসেবে একটা সাইকেল ভাড়া করলেন। বললেন, "চল, ব্যাণ্ডেল চার্চের মাঠে, সাইকেল শিখবি।"

মায়ের ভয়ে পিণ্টু বলল, "যদি হাত-পা ভাঙে ?"

মামা বললেন, 'ভাঙে ভাঙবে। তুই চল্ তো।" সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে বললেন, "লক্ষ-লক্ষ ছেলে সাইকেল চড়ছে, তাদের ক'জনের হাত পা ভাঙা দেখিস ?"

মামার শেখানোর পদ্ধতিই আলাদা। প্রথমেই বললেন, "ওঠ, সিটে উঠে পড়।" পেছন থেকে সাইকেল ধরে রইলেন। ভয়ে সিঁটিয়ে টাল খাচ্ছে পিণ্টু। মামা বললেন, "প্যাডেল কর, আমি ধরে আছি, পড়বি না। ও কী ! চাকার দিকে না, সামনের দিকে তাকা।" ঠেলে ঠেলে মাঠ পাক দিলেন। কখনও ধরে আছেন, কখনও ছেড়ে দিচ্ছেন। সেটা টের পেল না পিণ্টু, খানিকটা চালাল মামার সাহায্য ছাড়াই। উল্লাসে মামা বললেন, "এই তো পারলি। চালা, চালা।" ভয় ভেঙে গেল পিণ্টুর। হ্যাণ্ডেলের ব্যালেন্স রাখতে শিখল। ফেরার সময় মামা বললেন, "আর কিছু করতে হবে না আমাকে। সর্বক্ষণ তোর মাথার মধ্যে সাইকেলের চাকা ঘুরবে। বাড়িতে বলবি না। একদিন সাইকেল চড়ে বাড়ি গিয়ে চিমটিকে চমকে দিবি।"

পিণ্টুকে নিয়ে এমনি করে দিন কেটে যায় মামার। সারাক্ষণ দুজনে গল্প হচ্ছে। মামার দেশের বাড়ির ছেলেবেলার গল্প শুনলে পিণ্টুর মনে হয় মামা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। খালে-বিলে নৌকো বেয়েছেন মামা, তালগাছের ডোঙা ভাসিয়ে ঝুঁকে পড়ে পটাপট টেনে তুলেছেন শাপলা, একবার তো টানের চোটে ডোঙা দুলে উঠে ডুবে গিয়েছিল। নারকেল আর তালগাছে তরতর করে উঠতে পারতেন উনি। চেষ্টা করলে এখনও পারবেন। শীতের রাত্তিরে বাগানে গিয়ে হাঁড়িসুদ্ধু জিরেন কাটের খেজুররস চুরি করে খেয়েছেন। নুন দিয়ে জারিয়ে, বাটির মধ্যে নিয়ে বাটির মুখচাপা দিয়ে ঝাঁকিয়ে নরম করে, সাদা তুলতুলে বেতফল খেয়েছেন। গাছে চড়ে নিজের হাতে পেড়ে পাকা-পাকা গাব খেয়েছেন। পিণ্টু বেতফল দেখেনি, গাবও চেনে না। আহা রে, মামাদের ছেলেবেলার দিনগুলো কত রোমাঞ্চে ভরা ছিল !

আরও বড় রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছিল পিণ্টুর জন্যে।

হঠাৎ ওকে একদিন মামা নিয়ে গেলেন ক্যানিংয়ে। ওখানে মামার কিছু চাষবাস আছে। লাস্ট ট্রেনে ফিরছেন। একসময় পিণ্টু দেখল কামরায় শুধু ও আর মামা। মামা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর সেই কম্বলটি জড়িয়েছেন। মাথায় মাংকি-ক্যাপ। সিটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে অল্প অল্প ঝিমুচ্ছিলেন। একটা ছোট অন্ধকার সুনসান স্টেশনে গাড়ি থামল। চাদর-মুড়ি দিয়ে একজন যাত্রী উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল। লোকটা মামার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "যা আছে বার করুন।"

মামা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বোধহয় ভাবলেন ভিখিরি-টিকিরি কেউ হবে, বললেন, "যা যা, সর।" লোকটা একটা ছোরা বের করে মামার সামনে ধরল। পিণ্টু মামাকে ইশারায় জানাতে গেল, লোকটা হুমকি দিল, "এই ছোঁড়া, নড়বি না।

দেখেছিস ?" ছোরাটা ঘুরিয়ে দেখাল। পিন্টু ভয়ে আধমরা। চকিতে মামা স্প্রিংয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষিপ্রহাতে কম্বলটা গা থেকে খুলে লোকটার মুখের ওপর চাপা দিয়ে দিলেন। লোকটা চোখে দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কম্বল থেকে মুখ বের করবার চেষ্টা করছে, আর ঠিক তখনই ওর শিথিল হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিলেন মামা। বললেন, "আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিস ? ছিনতাই করবি ? তুই তো ছেলেমানুষ, এই কম্বল চাপা দিয়ে আমি গোখরোর ফণা মাটিতে ঘসে দিয়েছি, সুন্দরবনে।"

এই সব দুঃসাহসিক ব্যাপার-স্যাপার ভাল লাগেনি পিন্টুর বাবার। ঝানু উকিল। মামলার নথি দেখতে-দেখতে ছেলের মুখে অনেক মামা-কাহিনী শুনেছেন। পিন্টুর ধারণা হঠাৎ বিপদ হলে তক্ষুনি কী করতে হবে, ওর মামার মতন তা কেউ জানে না।

পিন্টুর বাবা একদিন বললেন, "আচ্ছা নিয়োগীদা, আপনি তো অনেক কিছু জানেন, মনে করুন, আমাদের পিন্টু ভুল করে এক দোয়াত কালি খেয়ে ফেলল, আপনি কী করবেন ?"

মামা একটু চুপ করে রইলেন, উকিলমানুষ হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছেন কেন আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন। তারপর বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "নেহাত ইডিয়ট না হলে এক দোয়াত কালি কেউ খাবে না।"

বাবা বললেন, "মনে করুন খেল। তখন আপনি কী করবেন ?"

মামা বললেন, "সে-রকম ছেলেকে আমিও তখন একদলা ব্লটিংপেপার খাইয়ে দেব।"

মামা চলে যাবার পর পিন্টুর বাবা এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছেন। পিন্টু তখন সেভেনে পড়ে। বাবা ওকে ইংরিজিতে ট্রানস্লেশন করতে দিয়েছিলেন—"আমার মামার অনেক গুণ।" পিন্টু লিখেছিল, "মাই আংকেল ইজ মাল্টিপারপাস।"

সেই থেকেই ঘেঁটুমামাকে পিন্টুর বাবা বলতেন, মাল্টিপারপাস মামা। পিন্টুর মা বলেছিলেন, "তোমাদের কোর্টকাছারির মুখে কিছু আটকায় না। শুনে শুনে ছেলে শিখবে, তারপর কোনওদিন ঘেঁটুদার সামনেই বলে বসবে।" তক্ষুনি পিন্টুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "মামা গুরুজন, মামাকে ওসব বলতে নেই কিন্তু।"

পিন্টু মায়ের কাছে শুনেছে, খুব ভাল অবস্থা ছিল ঘেঁটুদাদের। ছোটখাটো জমিদারের মতো। বাপের এক ছেলে ঘেঁটুদা। একটু বাউণ্ডুলে মতন। তবু দৌলতপুর কলেজ থেকে বি এ পাশ করেছেন। টাকাপয়সা জমিজিরেত কম ছিল না এককালে। দেশভাগ হল, সব বেচে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন, জমিবাড়ি সবই করলেন। নেই-নেই করেও যা আছে তাও অনেক। বিয়ে-থা করলেন না, চাকরি-বাকরিও না। নানা রকমের ব্যবসা করেছেন। কোনও কিছুই বেশিদিন ভাল লাগে না ঘেঁটুদার। মাঝেমধ্যেই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। হিমালয়েও ঘুরেছেন কিছুদিন। কলকাতায় এসে ওষুধের কারখানা করেছিলেন। বেশ চলছিল। একদিন যেই শুনলেন শস্তা দামের ওষুধ লোকে খেতে চায় না, তারা চায় বাহারি চটকদার বোতলে ভরা টনিক, যত দাম তত তাতে বিশ্বাস, দিলেন কারখানা বন্ধ করে। দিয়েই বেরুলেন দেশভ্রমণে। নিজেই বলেছেন, ইচ্ছে ছিল সাধুসঙ্গ করব, লোটাকম্বল নিয়ে সাধু হব। হল না। দেখলাম সাধুতেও ভেজাল। বছর-দশেক বাদে ফিরে এসে দেখেন পুরনো পাড়ার ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে, পাশটাশ করেছে, কিন্তু বেকার। আবার মাথার পোকা নড়ে উঠল। ওদের জন্যে হাওড়ার ঘুসুড়িতে একটা কারখানা খুললেন লোহালক্কড়ের। সেখানে ধুমধাম করে বিশ্বকর্মা পুজোও হয়, আবার সরস্বতী পুজোও হয়। সে-গল্প শুনে পিন্টুর বাবা বলেছিলেন, "সে কী নিয়োগীদা, কারখানায় সরস্বতী পুজো !"

মাল্টিপারপাস মামার অমনি চটজলদি উত্তর, "কেন হে উকিলবাবু, ছেনি-হাতুড়ি আর লেদ ড্রিলিংয়ের সঙ্গে কালি-কলম, বই-খাতা, সেতার-সরোদের কোনো বিরোধ আছে নাকি ?" পিন্টুর বাবা চুপ করে থেকেছেন। মামা একটু থেমে আবার বলেছেন, "সরস্বতীর হাতের যে বীণা, ওটা তৈরি করতেও হাতুড়ি-বাটালি লাগে।"

এই মামা কষ্ট পাবেন এমন কোনও কিছু বলার কথা ভাবতেই পারে না পিন্টু। মানুষটিকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে ও। সারাটা বছর মামার কথা মনে পড়ে ওর।

পরের বছর ঠিক ডিসেম্বরে আবার এলেন। এবার পিন্টু আবিষ্কার করল মামা যোগব্যায়াম করেন। মধ্যমগ্রামের বোনের ছেলে গৌরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন উনি, সে-ই বলল কথাটা। গৌর ক্লাস টেনে পড়ে, সে তুলনায় ওকে বেশ বড় দেখায়। এর মধ্যে বার-তিনেক ফেল করেছে ইস্কুলে। বেশ পুরুষ্টু গোঁফ, মস্তান-মস্তান চেহারা। ও শুনেছে, মামা নাকি কী একটা প্রাইজ রেখেছে মনের মতো ভাগ্নের জন্যে। ওর ধারণা সেটা ও-ও পেতে পারে। এবং সেটা মামার মৃত্যুর পর। গৌর পিন্টুকে আড়ালে ডেকে বলল, "বুড়োর কই মাছের জান। লুকিয়ে যোগ-ব্যায়াম করে। কাঁচা করলা চিবিয়ে খায়। ওগুলো বন্ধ করতে হবে, নইলে তোমারও কিন্তু আশা নেই।"

পিন্টু ভাবল, ছি, ছি, অল্প বয়সের ছেলে এত হৃদয়হীন হয় ! একটু রাগ করেই বলল, "আমার কিছু চাই না।"

গৌর যেন স্বগতোক্তি করল, "বুড়োর কী পেটা শরীর রে বাবা ! লাস্ট সিন চলছে, তবু ড্রপ পড়ে না।"

অনেক চেষ্টা করেও প্রাইজটা যে কী, তার অর্থমূল্য কত, কিছুই বের করতে পারল না গৌর। পরদিনই ও চলে গেল।

কাছেই গঙ্গা। পিন্টুকে নিয়ে রোজই গঙ্গার ধারে বেড়াতে যান মামা। একদিন বেড়াতে বেড়াতে বললেন, "ওপারে যাবি ? হাজিনগর ?" খেয়াঘাট থেকে একটা নৌকো ভাড়া করলেন। নৌকো চড়তে ভীষণ ভয় পিন্টুর। মামা সেটা লক্ষ করলেন। মাঝিকে বললেন, "খানিকটা পথ পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে চলো।" লগি মেরে নৌকো এগুচ্ছে। শীতের সকাল। টলটলে গঙ্গার জলে ভাপ উঠছে। মামা গল্প শুরু করলেন, ছেলেবেলার গল্প। তন্ময় হয়ে গেল পিন্টু। হঠাৎ মৃদু ধাক্কা দিয়ে ওকে জলে ফেলে দিলেন মামা। ঝপাং করে একটা শব্দ হল। মাঝি হা-হা করে উঠল, মামা ওকে নিরস্ত করলেন। নৌকোর গলুইয়ের কাছেই পিন্টু তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠল আবার। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। এলোপাথাড়ি হাতপা ছুঁড়ছে নিজেকে কোনও রকমে ভাসিয়ে রাখতে। ঢোকে ঢোকে জল খাচ্ছে। কাছেই নৌকো, সেটাকে ধরবার চেষ্টা করছে। মামা মাঝিকে ইশারায় বললেন, যেন নৌকো দূরে সরে না যায়। নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে কৌতুক অনুভব করছেন উনি।

একটু হাসলেনও। খানিক পরে মাঝির হাত থেকে লগিটা নিয়ে সেটা বাড়িয়ে ধরলেন পিণ্টুর দিকে। পিণ্টু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল লগিটা। সরসর করে ওকে টেনে এনে নৌকোয় তুললেন মামা। শীতে আর আতঙ্কে হি-হি করে কাঁপছে পিণ্টু। ওকে পরিচর্যা করতে করতে মামা বললেন, "সুইমিং ক্লাব নেই বলে সাঁতার শিখিসনি, না ? আমার সাঁতারের ইস্কুল এইরকম।" জল থেকে উদ্ধার পেয়ে, উষ্ণ হয়ে, বাড়ি ফিরে পিণ্টুর মনে হয়েছে আবার কবে গঙ্গায় আসব !

পরের বছর হৈ-হৈ করে মামা এলেন। এবার কিন্তু বেশির ভাগ সময় কাটালেন পিণ্টুর বাবার সঙ্গে। [illegible] সব কাগজপত্র লেখালেখি হল, কোর্টেও গেলেন। পিণ্টুর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার তেমন সময় পাচ্ছেন না। মনখারাপ হয়ে গেল পিণ্টুর। একবার বলতে গেল, এখন নিজে নিজেই সাইকেল চড়তে পারি মামা। ইস্কুলের বন্ধুদের সাইকেল নিয়ে শিখেছি। মামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "কাটা দাগটাগ তো কই দেখছি না।"

পিণ্টু বলল, "আমি একবারও পড়ে যাইনি মামা।"

মামা তাতে মোটেই তারিফ করলেন না। বললেন, "দুর্ভাগ্য তোমার। মায়ের কথাটা রক্ষা করলি না বাবা ? চিমটি বিশ্বাস করবে তো ?" তারপর সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "কাটা-ছেঁড়ার দাগ না থাকলে ছেলেবেলার স্মৃতি থাকল কী ! এই দ্যাখ—" বলে মাথার চুল সরিয়ে তালুতে একটা সাদা ফালা দাগ দেখালেন। বললেন, "এটা কিসের জানিস ? বন্ধুকে নিয়ে রাত্তিরে খেজুররস চুরি করতে গেছি, বন্ধু গাছে চড়েছে, আমি নীচে গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি। বন্ধুর হাত ফশকে দুম করে রসের হাঁড়ি মাথায় পড়ে খানখান। মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। এখনও এই বয়সে খেজুরগাছে হাঁড়ি ঝুলছে দেখলে অজান্তে মাথায় হাত চলে যায়।"

মামা বেশিদিন থাকলেনও না। পরে সব জানা গেল। কলকাতার বাড়ি, ক্যানিংয়ের জমিজমা, যেখানে যা ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘুসুড়ির কারখানা কো-অপারেটিভ করে দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীদের। একা-একা আর ভাল লাগছে না। খুঁজেপেতে বের করেছেন চিমটির মতো আর সব বোনেদের ঠিকানা। কেউ থাকে মধ্যমগ্রামে, কেউ কোন্নগরে, কেউ সরসুনায়, কারও বা বিয়ে হয়েছে দুর্গাপুরে। সাকুল্যে জনা-সাতেক। ঠিক করেছেন কারও বাড়িতে দু মাস, কারও বাড়িতে এক মাস থাকবেন। পেয়িং গেস্ট। পিণ্টুর মা বলেছেন, "আমি কিন্তু হাত পেতে টাকা পয়সা নিতে পারব না।" ঘেঁটুদা বলেছেন, "তোরাই তো আমার সব রে চিমটি। ভাগ্নের সংখ্যা এগারো। তার মধ্যে মধ্যমগ্রামের গৌর আর কোন্নগরের দিনুটা মানুষ হবে না।" বাকিদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা মামা লাগিয়ে দিয়েছেন। সব ব্যাপারে ফার্স্ট হলে প্রাইজ দেব। বোধহয় তাই নিয়েই উইল। পিণ্টুর বাবা ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন, ওর মাও জানতে পারেননি। মামার বারণ।

শেষ যেবার এলেন, সেই ডিসেম্বরেই, মামার শরীর খুব খারাপ মনে হল। সেই দশাসই চেহারা যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি যেন এতদিনে বুড়ো হয়েছেন মাল্টিপারপাস মামা। এখন ইলেভেনে পড়ছে পিণ্টু। অনেক কিছুই বুঝতে পারে। আসলে আপনজন মামার কেউ নেই। ওঁর টাকাপয়সার ওপর অনেকের লোভ, শেষ পর্যন্ত কে কী পাবে এই নিয়ে ফন্দি আঁটছে তারা।

মামার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন পিণ্টুর মা। বিশ্রাম দরকার। পিণ্টুও বেশি যায় না সে-ঘরে। মামা অনেকক্ষণ ধরে যোগব্যায়াম করেন। কিন্তু হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। সকালে জলখাবার দিতে গিয়ে পিণ্টুর মা দেখলেন ঘেঁটুদার গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। নিশ্বাস পড়ছে না। মুখ অল্প হাঁ হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিলেন পিণ্টুর বাবা। সব শুনে ডাক্তার বলল, "ডিসপেনসারি সেরে যাব'খন, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেব।"

এদিকে খবর পেয়ে ঝড়ের বেগে ধেয়ে এল গৌর আর দিনু। ওদের দাবি, প্রাইজ যদি দিতে হয় সব্বাইকে দিতে হবে। গৌর কোনও ভণিতা না করে পিণ্টুর বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "মাল্টিপারপাস মামার লাশ কোন্ ঘরে মেসোমশাই ?"

মাল্টিপারপাস মামা ! কথাটা শুনে এই দিনে বড় কষ্ট হল। উকিলবাবু বললেন, "তোমরা জানলে কী করে ?"

গৌর বলল, "কেন ? মামা তো নিজেই বলতেন।"

"কী বলতেন ?"

"বলতেন, দারুণ নাম দিয়েছে আমার পিণ্টু।"

মামার ঘরে পিণ্টুর কান্না শোনা গেল। গৌর আর দিনু সেই ঘরে ঢুকে গেল। ওরা দেখল মামার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে পিণ্টু কাঁদছে। দিনু বলল, "প্রাইজ দেখছি এ-ই পাবে।"

গৌর বলল, "পার্শিয়ালটি চলবে না। আমাদেরও প্রাইজ দিতে হবে।"

একটা অস্ফুট গোঙানি শোনা গেল। পিণ্টু মামার দিকে তাকাল। মনে হল মামা একবার যেন ওর দিকে তাকালেন। বুকে কি চাপ লাগছে ওঁর ? কষ্ট হচ্ছে ? মৃতের রক্ত জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তাকে বলে রায়গর মর্টিস, বইয়ে পড়েছে পিণ্টু। তার আগে কি মৃতের ব্যথাবেদনা বোধ থাকে ? খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে গৌর, মৃতদেহের ডানদিকে, কাছেই। দেখল, মড়ার ডান হাতটা শূন্যে উঠছে। গৌর সভয়ে সরে যেতে গেল, মড়া হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেলল। বলল, "প্রাইজ নিতে এসেছিস বুঝি ? ভাগ্নেদের মধ্যে সেরা ভাগ্নেকে বিলেত যাবার খরচ দেব, উইল করেছি। সে তো তুই নোস।"

ডাক্তার যখন এলেন, তখন বাইরের ঘরে বসে গল্প করছেন মামা। ডাক্তার বললেন, "ডেডবডি কোথায় ?" মামা বললেন, "এই যে আমি। একটু আগে এলে ডেড দেখতে পেতেন।" সব শুনে ডাক্তার পরে পিণ্টুর বাবাকে বলেছেন, "এরকম হয়। কিছুক্ষণের জন্যে একটা মানুষ মরে গেছে, মানে প্রাণের কোনো লক্ষণই নেই, এরকম ঘটনা খুব রেয়ার ; কিন্তু হতে পারে। একে বলে সাসপেণ্ডেড অ্যানিমেশন।"

মামা বললেন, "ওরা জানে ছাই। এসব হচ্ছে যোগব্যায়ামের ফল। প্রাণায়াম। দেখিসনি, মাটির নীচে পুঁতে দিয়েছে, তিন-চার ঘণ্টা পর ওঠাল, ঠিক বেঁচে আছে ? একটু থেমে দম নিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে বললেন, "জানিস পিণ্টু, বুকের ধুকপুকি কিন্তু থেমেই গিয়েছিল, তুই শোকে দুঃখে আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়লি, আমি টের পেয়েছি, ঠিক তখনই এক ধাক্কায় কলকব্জা আবার চালু হয়ে গেল।"

ছবি : প্রবীর সেন

ধাঁধা

ছোট্‌কার কথায় সেদিন যেন ফুলঝুরি জ্বলছিল। ঠিক তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি চমক-জাগানো সব কথা।

গোল হয়ে বসেছি আমরা। আমি, গৌরী, ছোড়দি—সবাই। ছোট্‌কা মধ্যমণি। সেই দুপুর থেকে আসর চলছে। ছোট্‌কা এক-একটা প্রশ্ন করছে। ধারালো ও মজাদার প্রশ্ন। উত্তর দিতে হবে আমাদের। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর চাই। বেশিরভাগ সময়েই আমরা হেরে যাচ্ছি। আর, তার ফলে, মজা বাড়ছে। কেননা, ছোট্‌কা শুধু প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। না পারলে হাতেনাতে উত্তরও বলে দিচ্ছে। আর উত্তরটা শুনেই কী মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, আরে, এ তো দারুণ সোজা। একটু চেষ্টা করলেই আমরা ঠিক পেরে যেতাম। ভাবছি বটে পেরে যেতাম, কিন্তু পারছি যে না, সেটাও সত্যি।

যেমন ধরো, ছোট্‌কা প্রশ্ন করল, ঘড়ি কেন লাজুক ? এখন এই প্রশ্নটা শুনে তুমি কী উত্তর দেবে ? চট করে কি কিছু মাথায় আসে ? ফলে, আত্মসমর্পণ।

কিন্তু ছোট্‌কা যখন উত্তরটা বলল, তক্ষুনি লজ্জা পেলাম। যেমন ওই প্রশ্নটার উত্তর হল, কেননা, দুহাত দিয়ে সব সময় ঘড়ি তার মুখ ঢেকে রাখে।

তা এবারের নতুন ধাঁধা ওই স্টক থেকেই দিচ্ছি। খুব চটপট উত্তর করা চাই কিন্তু।

প্রথম ধাঁধা ॥ কী সেই জিনিস যা যখন পরিষ্কার তখন কুচকুচে কালো, যখন অপরিষ্কার তখন সাদায় সাদা ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দেওয়াল ভেদ করে কীভাবে দেখা যায় ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ পাঁচ অক্ষরের ইংরেজি শব্দ থেকে দুটো অক্ষর সরিয়ে নিলেও ছয় পড়ে থাকে ?

গতবারের উত্তর ॥ (প্রথম ধাঁধা) ১ ছ ২ ক ৩ ঙ ৪ খ ৫ ঘ ৬ জ ৭ গ ৮ চ। (দ্বিতীয়) বালতিতে একটি ফুটো যোগ করতে হবে। (তৃতীয়) ৪০।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
৭		■		■	৮	
	■	৯			■	
■	১০	■		■	১১	■
■		■		■		■
১২		■		■	১৩	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) অযোধ্যার নদী। (৩) বিখ্যাত পাখি। (৫) রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। (৭) সভা-সমাবেশে যাঁর কথা অনেকে শোনে। (৮) মঙ্গল। (৯) যে-খেলায় দম চাই, হতে হয় চটপটে। (১২) রত্নবিশেষ। (১৩) শিবের অনুচর।

উপর-নীচ : (১) দিঘি। (২) হাড়িকাঠ। (৩) ঈশ্বর। (৪) তছনছ। (৬) ঢাক-ঢোলকের আওয়াজ। (১০) খেয়ামাঝি। (১১) শূন্যযান।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

শ	ত	দ	ল	■	■	■
হি	■	■	ঘু	ঙু	র	■
দ	শা	হ	■	■	বি	ধু
■	মি	■	■	■	ক	■
ছা	য়া	■	■	খ	র	চ
■	না	য়ে	গ্রা	■	■	শ
■	■	■	ম	হ	কু	মা

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা এতই মজাদার যে মনে হবে, এমন খেলাই রোজ-রোজ শিখি।

কী লাগবে ?

লাগবে দশটা টুথপিক অথবা দেশলাইকাঠি। আর বন্ধুবান্ধব, যাদের জন্য এই মজার খেলা।

আরও একটা জিনিস চাই এ-খেলার জন্য, সেটা হল একটা টেবিল। টেবিলের যেদিকে তুমি থাকবে সেদিকেই, খেলার শুরুতে, বন্ধুদের ডেকে নেবে। তারপর তাদের চোখের সামনে দশটা কাঠি দিয়ে নীচের ভুল অঙ্কের মতো একটা অঙ্ক টেবিলের ওপর সাজাও।

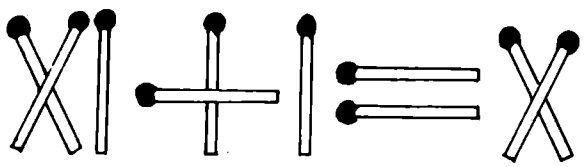

এবার তাদের বুঝিয়ে বলো, কী করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, টেবিলের ওপর একটা ঠিক-ঠিক অঙ্ক সাজাতে হবে। কিন্তু সাজাবে কীভাবে ? অর্থাৎ কটা কাঠি সরিয়ে ফের বসাবে।

না। একটা কাঠিও সরাতে পারবে না। তবু একটা ঠিক অঙ্ক থাকবে টেবিলে। আর কীভাবে সেটা কী হবে, সেটা বুঝুক বন্ধুরা, যাদের তুমি সমস্যাটার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ।

কী, পারল না তো কেউ ?

বেশ। এবার তাহলে তোমার দেখাবার পালা। বন্ধুদের নিয়ে এবার তুমি চলে যাও টেবিলের ঠিক উল্টো দিকটায়। সেখান থেকে এবার অঙ্কটার দিকে তাকাও। দ্যাখো, কী নির্বিকার ও নির্ভুল অঙ্ক তোমাদের সামনে তাকিয়ে রয়েছে।

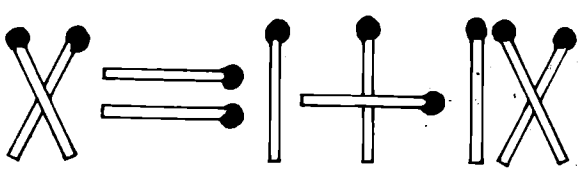

মজারু

হাসিখুশি

"আমি রানে কখনও ফার্স্ট হতে পারি না। প্রতিবারই লাস্ট হই।"

"সেইজন্যই তো বাবা-মা তোমার নাম রেখেছেন হারান।"

"আপনার 'কী করে লম্বা হবেন' বইটা এক কপি দেবেন ?"

"কাজের ছেলেটা বইগুলো তাকের উপর তুলে রেখেছে। নামাতে পারছি না।"

"আচ্ছা বাবুয়া, 'নাইরোবি সম্পর্কে ধারণা'—এটার ইংরিজি কী হবে ?"

"কেন স্যার, 'NOTION ABOUT NO-SUN'."

"বলছেন চেকের সইটা মিঃ মজুমদারের। তো, আপনি জানলেন কী করে ?"

"সইটা যে স্যার আমিই করেছি।"

নারানবাবুর হাত দেখে এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, তাঁর জীবনে বহু উত্থান-পতন ঘটবে। জ্যোতিষীর কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেছে। নারানবাবু এখন একটি নামকরা অফিসের লিফটম্যান।

"পরোক্ষ করের একটা উদারণ দিতে পারো বাবুয়া ?"

"পারি স্যার। ডগ ট্যাক্স—কুকুরকে ওটা দিতে হয় না।"

" 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'—এখানে বাঘ কোন্ পদ বাবুয়া ?"

"শ্বাপদ, স্যার।"

ছবি : দেবাশিস দেব

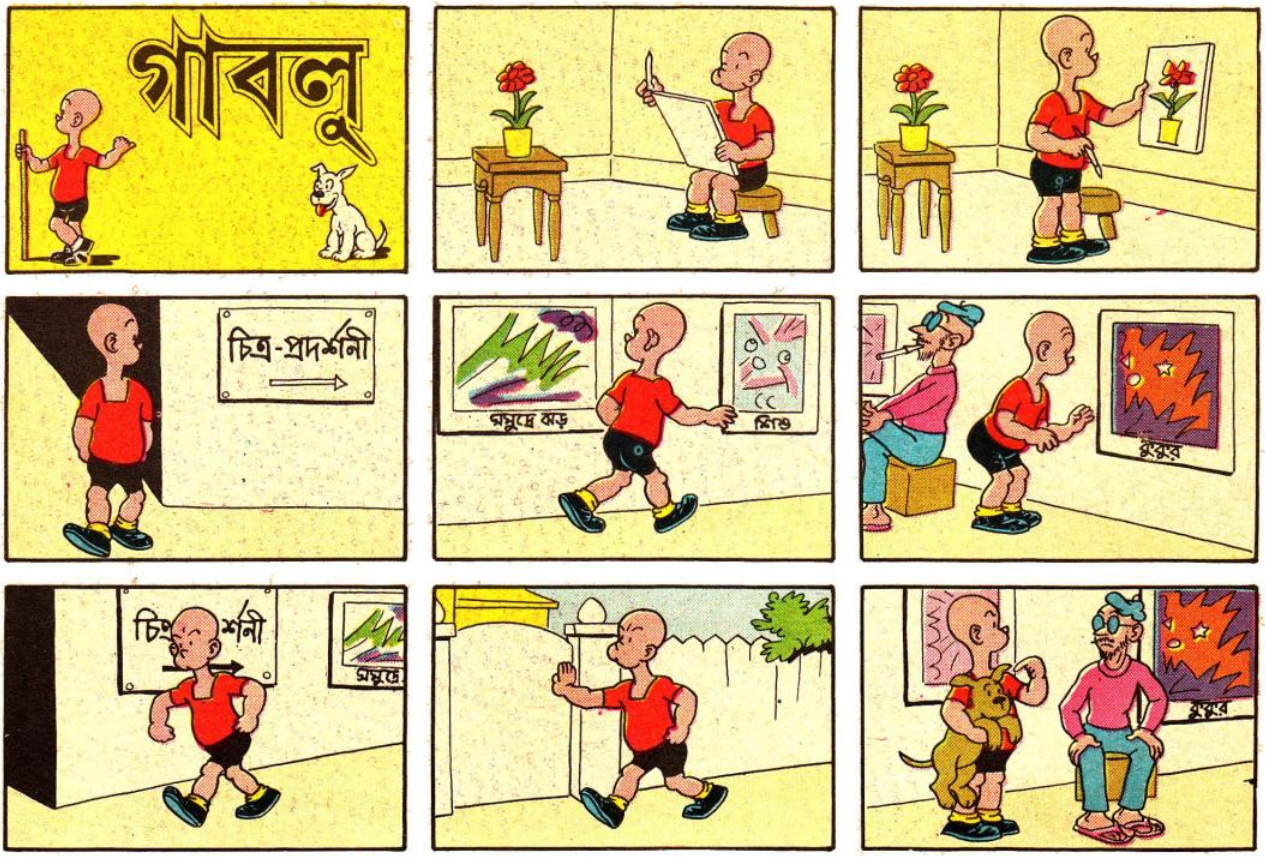

গাবলু
চিত্র-প্রদর্শনী
সমুদ্রে ঝড়
শিশু
কুকুর
চিত্র
র্শনী
সমুদ্রে
কুকুর

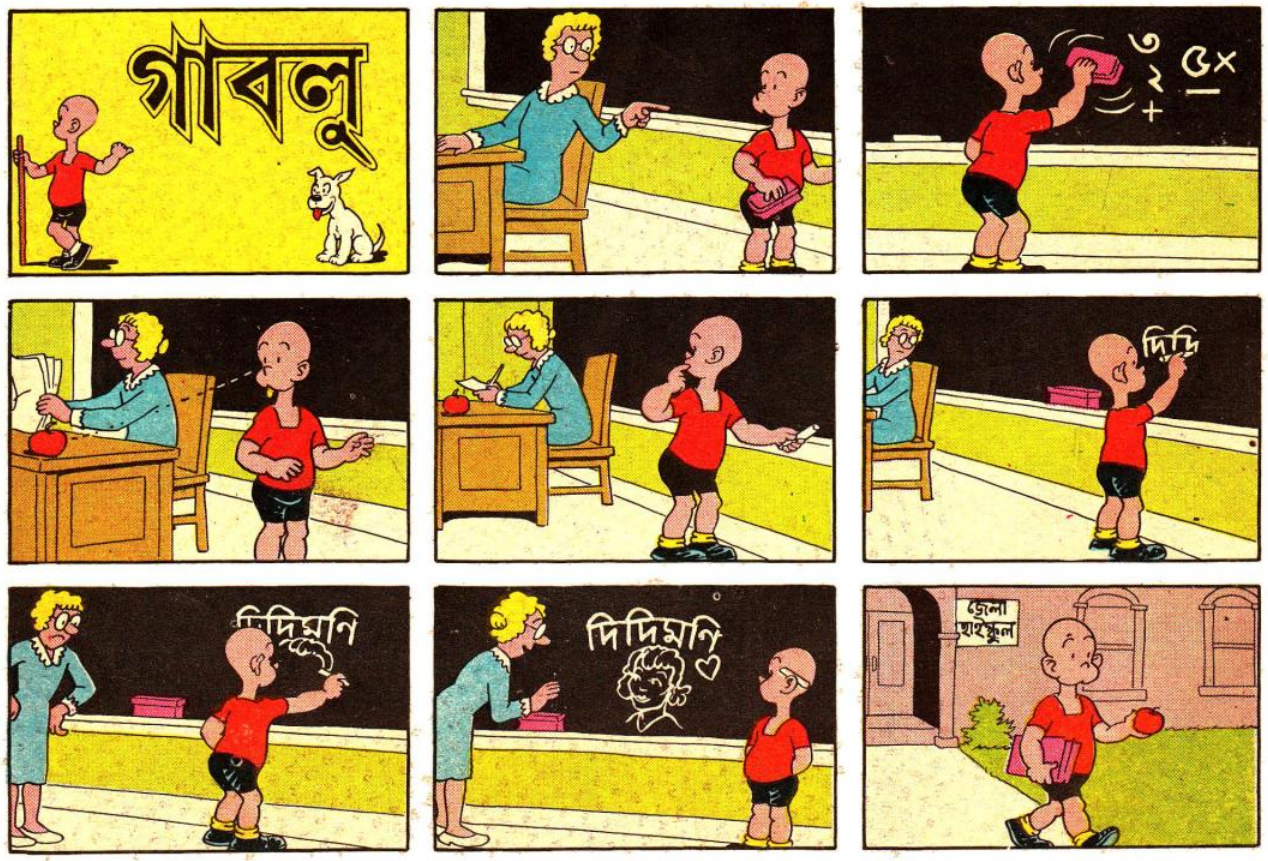

গাবলু
৩
২
+
৫×
দিদি
দিদিমনি
দিদিমণি
জেলা
হাইস্কুল

কলকাতা-ফুটবলে তিন প্রধান দলের দুর্গ যাঁরা রক্ষা করবেন

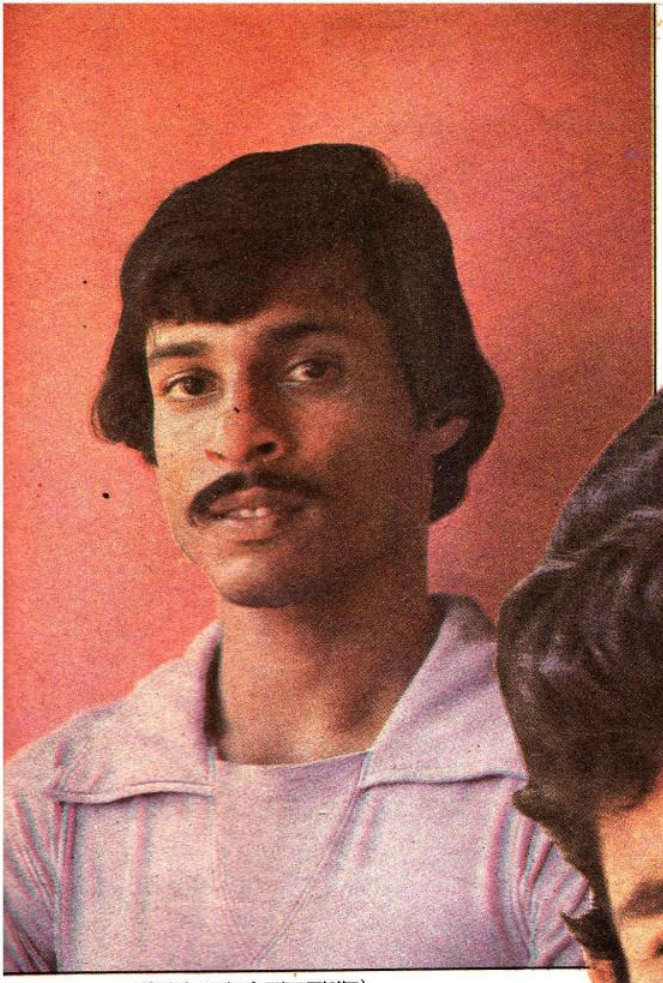

প্রতাপ ঘোষ (মোহনবাগান)

ভাস্কর গাঙ্গুলি (ইস্টবেঙ্গল)

অতনু ভট্টাচার্য (মহমেডান)

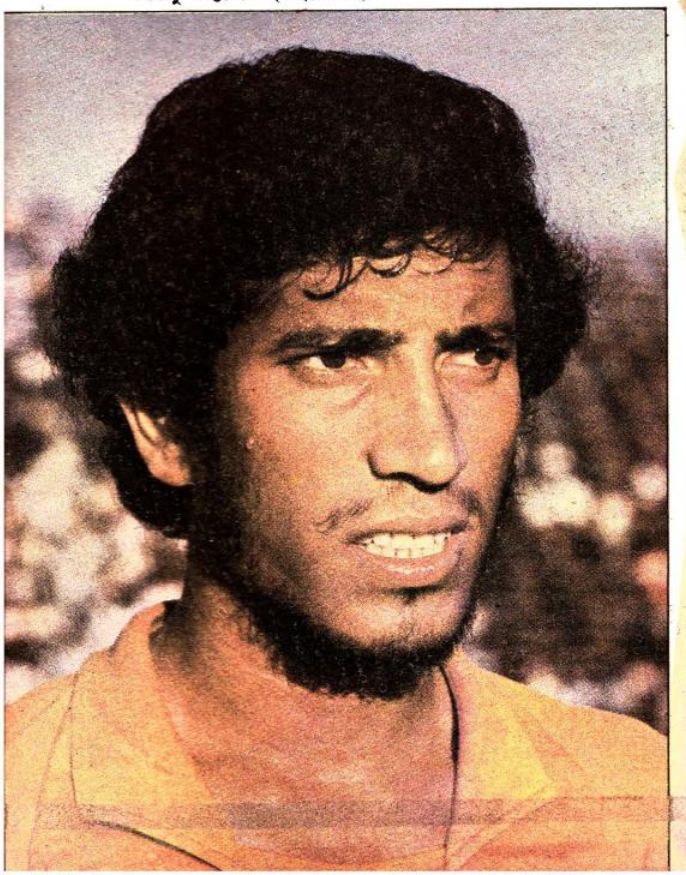

পি কে'র সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা

নৃপতি চৌধুরী

ঠিক-ঠিক হিসেবে দু'দিনে সতেরোটি ফোন, জনাতিরিশ লোকের নানারকম বায়নাক্কা, একগাদা অফিসিয়াল ফাইলে সই করা এবং জনচারেক ফুটবলারের চোট-আঘাতের দাওয়াই বাতলে দেবার ফাঁকে-ফাঁকে হাসিমুখে আমার প্রশ্নের অত্যাচার সামলাচ্ছিলেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি কে বলে যাঁকে তোমরা একডাকেই চিনবে।

"হ্যাঁ, কাগজে-কলমে ইস্টবেঙ্গল এবার খুব শক্তিশালী। অন্তত সাধারণ মানুষের তাই ধারণা। কিন্তু কোচ হিসেবে আমার মুশকিলটা বেধেছে অন্য জায়গায়। একই পজিশনে একাধিক নামী খেলোয়াড় থাকায় ফাইনাল ইলেভেন বেছে নেওয়া বেশ কষ্টকর। যেমন, আমার টিমে বাঁ দিকের হাফ নেই। বিকাশ, দেবাশিস মিশ্র আর সুনির্মল তিনজনেই ডান পায়ের প্লেয়ার। ওই তিনজনই খুব খেটে খেলার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মাঝমাঠ থেকে খেলা তৈরি করার, যাকে বলে গেম-মেকিং ক্ষমতা ওদের ততটা নেই। ভাবতে হবে সুদীপকে সেন্টার মিডফিল্ডার হিসেবে ব্যবহার করব কি না।"

"আপনার টিমে ফরোয়ার্ড লাইন নিয়েও কি একই সমস্যা দেখা দেবে না?"

"আলবত। আমার টিমে দক্ষ স্ট্রাইকার আছে যারা যে-কোনও সিচুয়েশনে লড়ে যাবে। যেমন জামশেদ, দেবাশিস রায়। আবার কৃশানু-বিশ্বজিৎও ভাল গেম-মেকিং স্ট্রাইকার। কিন্তু পজিটিভ উইংগার কই? এই বিভাগে আমরা খানিকটা কমজোরি হয়ে আছি।"

"টিমের ডিপ-ডিফেন্স সম্পর্কে চিন্তার কিছু আছে কি?"

এই একটি প্রশ্নে পি কে-কে একটু নিরুদ্বিগ্ন মনে হল।

"হ্যাঁ, মনা-তরুণ-সুদীপ থাকায় ডিপ-ডিফেন্স অন্তত কাগজে-কলমে শক্তিশালী। সাইড-ব্যাকে বলাই, অলোকও রয়েছে। তবে নতুন ছেলে কবীর বসুকে নিয়েছি। তাকে সুযোগ দেবার কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। ডিপ-ডিফেন্স হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু লাস্ট লাইন অব ডিফেন্স মানে গোলকিপিং?"

প্রশ্নটিকে আমারই সামনে ঝুলিয়ে দিলেন পি কে। তারপর নিজেই বললেন, "ভাস্কর ছাড়া আর গোলকিপার নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও ম্যাচে যদি ভাস্কর খেলতে না পারে তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিটাই হয়ে পড়বে সবচেয়ে কমজোরি।"

"তাহলে কি বর্তমান টিম নিয়ে আপনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন?"

"এখন আর এসব ভাবছি না। যা আছে তাই নিয়েই চেষ্টা করে যাব। সামনেই তো ফেডারেশন কাপ।"

"আচ্ছা, ঘরোয়া ফুটবলে আপনি কোচ হিসেবে বিরাট সাফল্য পেয়েছেন। এর পেছনে আসল কারণটা কী?"

"কারণ একটাই। আমি সিনসিয়ারলি খাটি।"

"আপনি সিনসিয়ারলি খাটেন, অন্য কোচরা কি সিনসিয়ারলি খাটেন না?"

"অন্য কোচেদের কথা বলতে পারব না। আমি প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সাইকোলজি, ফুড-হ্যাবিট, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টাডি করি। তাদের সমস্যা সমাধানে বন্ধুর মতো ব্যবহার করি। ওরা আমার কাছে অনেক বেশি সহজ হতে পারে। কোচ হিসেবে এটা হয়তো আমাকে বাড়তি সহায়তা দেয়।"

"মোহনবাগান অমল দত্তকে কোচ করায় আপনার ওপর কি বাড়তি মানসিক চাপ পড়বে না?"

"বিন্দুমাত্র নয়। আমার ভাবনার জগৎ আমার টিমকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। সেখানে অন্য টিমের কোচের কোনও স্থান নেই। এই তো এক ব্রিটিশ কোচ আমাকে একটা বই পাঠিয়েছেন—স্পিড বাড়াবার লেটেস্ট থিয়োরি এতে আছে। কী করে প্লেয়ারদের ওপর অ্যাপ্লাই করা যায় চেষ্টা করব।"

হাত বাড়িয়ে বইটা নিলাম। বিল মার্লোর লেখা 'স্প্রিন্টিং অ্যাণ্ড রিলে রেসিং'। বইটা একটু দেখে ফেরত দেবার সময় বললাম,—"আশা করছি ইস্টবেঙ্গল এবার গতিময় ফুটবল খেলবে।"

"দেখা যাক।" বলেই পি কে হাসলেন। কেন যেন মনে হল কিঞ্চিৎ ভাবনাবিদ্ধ হাসি।

শাস্ত্রীর বাঁ হাত

অশোক রায়

ভোর চারটে, শারজা থেকে বোম্বাই। সাড়ে-নটা, সোজা মাঠে। ক্লান্ত গাওস্করের একটু বিশ্রাম দরকার ছিল। ভেবেছিলেন টসে জিতলে হয়তো বিশ্রাম মিলবে। টসে জিতলেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্রাম মিলল না। পাঁচদিনব্যাপী রঞ্জি ফাইনাল শুরুর আশি মিনিটেই মাত্র বিয়াল্লিশ রানে তিন ব্যাটধারীকে হারিয়ে বিপদগ্রস্ত বোম্বাই শরণাপন্ন হল গাওস্করের : সানি, সামলাও।

অতঃপর যে দৃশ্যটি অভিনীত হল সেটি আমরা উনিশশো সত্তর সাল থেকে বহুবার দেখেছি। ভারতীয় ক্রিকেটের বৃহত্তম রান-যন্ত্রটি ক্লান্তিহীনভাবে রান উৎপাদন শুরু করে দিল সন্দীপ পাটিলকে সঙ্গে নিয়ে। বোম্বাই ৩৩৩ রানে পৌঁছল, যার মধ্যে সানির সংগ্রহ ১০৬। দিল্লির অধিনায়ক মদনলাল পেলেন ৪২ রানে চার উইকেট। কোনও-কোনও মহলে শোনা যাচ্ছে, রঞ্জি ট্রফিতে এটাই সানির শেষ ম্যাচ। শোনা কথা সত্যি হলে বলতেই হয়, শেষ ম্যাচেও শতরান করে সানি প্রমাণ করে দিলেন নির্ভরতার অন্য নাম সানি গাওস্কর।

উইকেট সহজ ছিল। কিন্তু রাজু কুলকার্নির গতিতে দিল্লি শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ৮৭ রানে পাঁচ উইকেট হারানো নিমজ্জমান দিল্লিকে ব্যক্তিগত সামর্থ্যে সম্মানজনক উচ্চতায় টেনে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় হলেন দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার চেতন চৌহান (৯৮) এবং মদনলাল (৭৮)। ১৯১ রানের মাথায় বিতর্কিত সিদ্ধান্তে মদনলাল আউট হলেও তাঁর অদম্য মনোভাব সংক্রামিত হয় বাইশ বছরের তরুণ অজয় শর্মার ব্যাটে। জীবনের চতুর্থ ম্যাচে বোম্বাইয়ের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসাধারণভাবে জ্বলে উঠলেন অজয়। দলের ব্যাটিং 'পুচ্ছটিকে' সযত্নে আড়াল করে অজয়ের সংগ্রামী ১৩১ দিল্লিকে পৌঁছে দিল ৩৯৮ রানে। বোম্বাইয়ের পক্ষে মিডিয়াম পেসার রাজু কুলকার্নি পেলেন পাঁচ উইকেট।

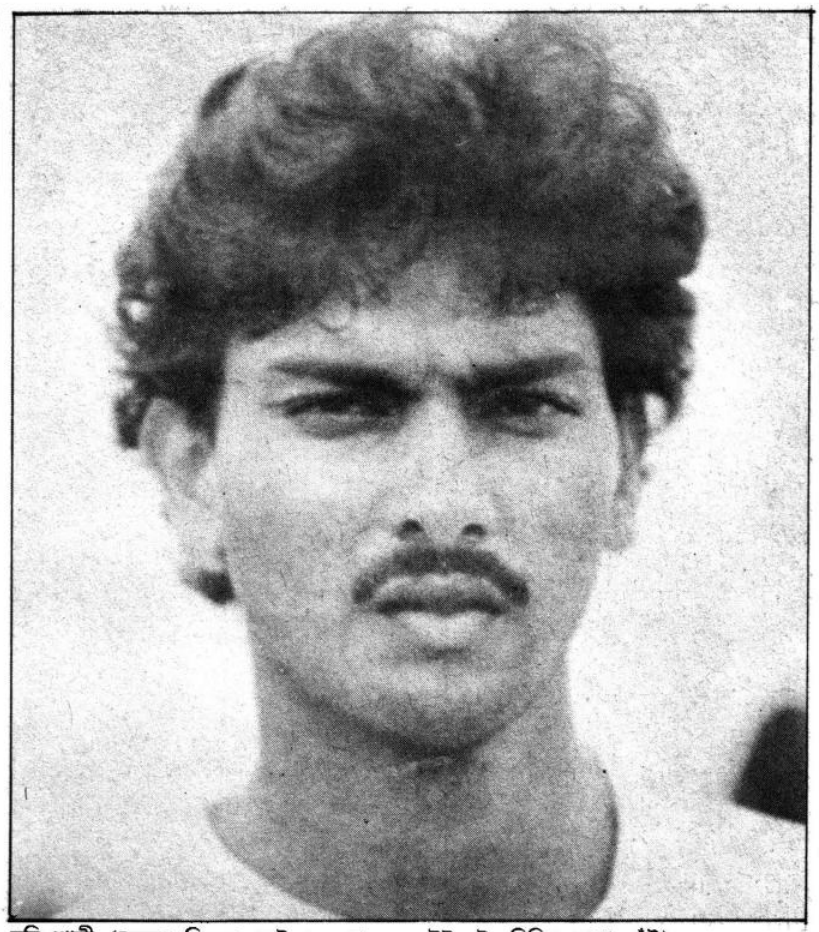

রবি শাস্ত্রী (দলকে দিলেন ভেট ৯১ রানে ৮ উইকেট, দিল্লির মাথা হেঁট)

প্রথম ইনিংসের ৬৫ রানের ব্যবধান ঘোচাবার আগেই বোম্বাইয়ের দুই ওপেনারকে উপড়ে ফেলেন দিল্লি-দলপতি মদনলাল। কিন্তু বোম্বাইয়ের পরবর্তী ব্যাটসম্যানরা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে রুখে দাঁড়ালেন। লালচাঁদ রাজপুত (৬৩), সন্দীপ পাটিল (৫৭), গাওস্কর (৬৪), রবি শাস্ত্রীর (৭৬) আরমুখী ব্যাটিংয়ের সহায়তায় বোম্বাই সাত উইকেটে ৩৬৪ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় সরাসরি ম্যাচ জিতে নেবার।

প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় দিল্লি কিছুটা সুবিধেজনক অবস্থায় ছিল। উইকেটও ছিল সহজ। দিল্লির দুই ওপেনার চেতন চৌহান (৫১) ও মনোজ প্রভাকর (৪৪) ৯৫ রান জুড়লেন প্রথম উইকেটে। স্বচ্ছন্দ শুরু। কিন্তু তার পরই বদলে গেল ম্যাচের ছবিটা। রবি শাস্ত্রীর বাঁ হাতটি হঠাৎই যেন ভেল্কি দেখাতে শুরু করল। এক প্রান্ত থেকে একটানা বল করে শাস্ত্রী শুইয়ে দিলেন দিল্লিকে মাত্র ৯১ রানে ৮ উইকেট নিয়ে। রঞ্জি ট্রফিতে জীবনের সেরা বোলিং করে শাস্ত্রী একটি অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে আনলেন দিল্লির মুঠো থেকে। দিল্লি গুটিয়ে গেল মাত্র ২০৯ রানে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতেই হবে, গাওস্করের অসুস্থতার কারণে অধিনায়কত্ব করেন সন্দীপ পাটিল। বলা যায়, তাঁরই উজ্জীবিত নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত জয় পায় বোম্বাই।

রঞ্জি ট্রফির গোল্ডেন জুবিলি বর্ষে এই সাফল্য বোম্বাইকে শুধু তিরিশ বার খেতাব অর্জনেই সাহায্য করল না, সেই সঙ্গে আরেকটি অবিশ্বাস্য রেকর্ডেরও অংশীদার করে রাখল। রঞ্জি ট্রফি শুরুর বছরে বিজয়ী হয়েছিল বোম্বাই, জিতেছিল প্রতিযোগিতার সিলভার জুবিলি ইয়ারেও। আর এবারের জয় তো গোল্ডেন জুবিলির সোনার ফসল।

দুই সকালে দুই শিবিরে

সুজয় সোম

ফুটবল খেলাতেও এখন ভেজাল ! কলকাতা শহরের বেশিরভাগ তারকা-ফুটবলার রাজ্যের বা দেশের হয়ে খেলতে নেমে বিনা যুদ্ধে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। একের পর এক আন্তর্জাতিক লড়াই দেখে ঠাওর করা গেল, যুঝবার সামর্থ্যও নেই তাঁদের। ক্লাব ফুটবলেই বেশি আগ্রহ। দক্ষতাও। সেখানেও আবার গট-আপ খেলা ! কাণ্ড দেখে হতাশ ভক্ত আর উৎসাহীরা নিন্দায়, ধিক্কারে, ঘৃণায় মুখর হলেন। তবু এবারেও ফুটবলাররা নিলামে চড়ালেন নিজেদের।

বুধবার, তেসরা এপ্রিল সকালে উনিশশো পঁচাশির ফুটবল মরসুমের অনুশীলন শুরু হল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। ক'দিন পরে দুই সকালে দুই শিবিরে হাজির হয়ে অবাক চোখে দেখলুম, প্রিয় দলের প্র্যাকটিসেই কলকাতা উপচে পড়েছে দুই মাঠে ! রসাতলে যাওয়া ভারতীয় ফুটবল নিয়ে কী দরকার এত হৈ-চৈ, মাতামাতি, পাগলামি, আদিখ্যেতার ?

মোহনবাগান মাঠে গিয়ে দেখলুম, কোচ অমল দত্ত খেলোয়াড়দের ওয়ার্ম-আপ করাচ্ছেন। তারপর দু'দলে ভাগ হয়ে খেলা হল। শেষে অনেকটা সময় শুটিং, হেডিং অনুশীলন। টেন্টে ফিরে গা এলিয়ে দিলেন ফুটবলাররা। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিদেশ বসু, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য, কার্তিক শেঠ, সুবীর সরকার, সত্যজিৎ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু রায়, জগদীশ ঘোষ।

"কেমন চলছে প্রস্তুতি ?"

আমার কথা শুনেই উঠে বসলেন বিদেশ, "চমৎকার ! যে যাই বলুন, যেমন পরিস্থিতিই হোক, এবারেও আমরা দারুণ লড়ব।

"ক্যাপ্টেন হিসেবে কী ভাবছেন ?"

"অফিসিয়ালি ঘোষণা হোক, তারপর

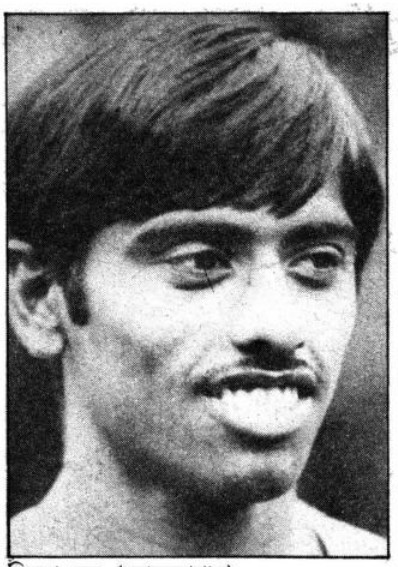

বিদেশ বসু (মোহনবাগান)

ক্যাপ্টেন হিসেবে ইন্টারভিউ দেব। এখন নয়, প্লিজ।"

এরিয়ান্স থেকে সাতাত্তর সালে মোহনবাগানে এসেই রাতারাতি তারকা বনে গেছিলেন বিদেশ। বাঁ-দিকের সাইড লাইন ধরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে, হুড়মুড় ছুটে, শত্রুপক্ষের ডিফেন্স তছনছ করে চমৎকার একটা ব্যাক সেন্টার—তা থেকে কত যে সোনা বাঁধানো গোল পেয়েছে মোহনবাগান ! ফুটবলের পণ্ডিতরা যে বলেন, উইঙ্গারের দৌড়কেই সবচেয়ে ভয় পান ডিফেণ্ডাররা, কথাটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বিদেশ, সাতাত্তর সালেই। অমন অসাধারণ লেফ্‌ট উইঙ্গারকে এখনও আটকানো মুশকিল !

বলাই মুখোপাধ্যায় অতটা ডাকসাইটে খেলোয়াড় নন। বাংলা বা ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি আজও।

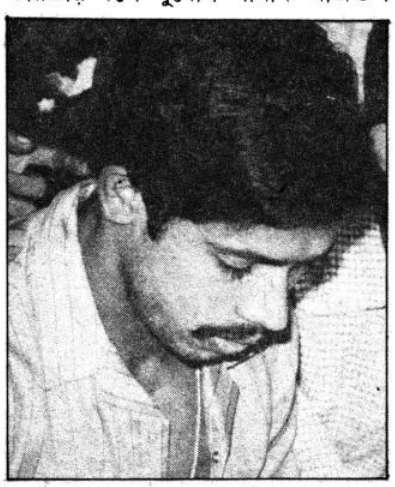

বলাই মুখোপাধ্যায় (ইস্টবেঙ্গল)

কিন্তু ইস্টার্ন রেল, খিদিরপুর, এরিয়ান্স, মহামেডান স্পোর্টিং পেরিয়ে বিরাশি সালে ইস্টবেঙ্গলে ঢুকেই নিজের জায়গা পাকা করে নিলেন। চমৎকার স্পিড, স্কিল, ট্যাকলিং। বিদেশের মতো বলাইও বেজায় লাজুক, শান্ত। মিষ্টি স্বভাবের ছেলে।

ইস্টবেঙ্গল মাঠে পৌঁছলুম প্র্যাকটিসের শেষ পর্বে। কোচ প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পি কে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সহকারী শ্যাম থাপা দু'দলে ভাগ করে খেলাচ্ছেন ছেলেদের। খানিক বাদে টেন্টে ফিরে গা-হাত-পা মুছে, লেবু-চায়ে চুমুক দিয়ে পঁচাশি সালের অধিনায়ক বলাই বললেন, "কাগজে-কলমে এক নম্বর টিম আমাদের। কিন্তু অনেক প্রবলেমও। একই পজিশনে সমান দক্ষতার দু-তিনজন ! ডিফেন্সে ভারতের তিন সেরা স্টপার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ দে। তা ছাড়া অলোক মুখোপাধ্যায়। ব্যাকে সমীর চৌধুরি, কবীর বসু, দেবদ্যুতি দেবনাথ, আমি। তবে পজিটিভ লেফ্‌ট উইঙ্গার এবং লেফ্‌ট হাফব্যাক নেই !"

"আপনাদের তিন লিঙ্কম্যানই বাঁ-পায়ের খেলোয়াড় ! বিকাশ পাঁজি, দেবাশিস মিশ্র, সুনির্মল চক্রবর্তী।"

"হ্যাঁ। আমার ধারণা, হাফ-লাইনের অ্যাটাকিং দক্ষতার চেয়ে ডিফেন্সিভ দক্ষতা বেশি।"

"ফরোয়ার্ডে ?"

"কৃশানু দে ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য গেম মেকার কাম স্ট্রাইকার। বিশু খুব খাটিয়ে। কৃশানুর স্কিল অসাধারণ। বিশু, জামশিদ নাশিরি, দেবাশিস রায় ভাল হেডার। সন্দীপ মুন্সির স্পিড দারুণ। আসলে স্ট্রাইকার হলেও মনোজিৎ দাশকে বোধহয় রাইট উইংয়ে খেলতে হবে। তবে প্রথম এগারোজনকে বেছে নিতে ভীষণ সমস্যায় পড়বেন প্রদীপদা !"

"ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় গোলকিপার কে হচ্ছেন ?"

"সেটা ঠিক হয়নি। বিজন চক্রবর্তী ও আসলাম আমেদ ছাড়াও ষোলো বছরের চমৎকার একটা ছেলেকে নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছেন প্রদীপদা। সুদীপ চক্রবর্তী।"

ফুটবলাররা ঘুমিয়ে রইলেন

সম্রাট রায়

"খেলা কেমন দেখলেন?" প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের শেষে সল্ট লেক স্টেডিয়াম থেকে বেরুতেই মুখোমুখি দেখা ভদ্রলোকের সঙ্গে। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। তবু নিয়মিত মাঠে যান। সেই সুবাদেই আলাপ। প্রশ্নটা ওঁকেই করেছিলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বাংলার শেষ নবাবদের খেলা?"

প্রশ্নের মধ্যেই শ্লেষ এবং উষ্মা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। আমি উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক একেবারে অভাবিতভাবে প্রসঙ্গ পাল্টে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার ওপর। "আপনাদের জন্যে, স্রেফ আপনাদের জন্যেই আজ ফুটবলের এই দশা।"

গলা তো নয়, যেন আণবিক বিস্ফোরণ। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু অত্যুৎসাহী লোক ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে লেপ্‌টে গেল। ভদ্রলোক তখনও উত্তেজিতভাবে বলে যাচ্ছিলেন, "আপনাদের হাতে কাগজ-কলম রয়েছে বলে যা-খুশি তাই লিখে যাচ্ছেন। অপদার্থ ফুটবলারদের দেবতা বানাচ্ছেন, সুপার স্টার তৈরি করছেন, সবই মেনে নিতে হচ্ছে।"

"দেখুন, কাগজের লোকেরা কী করবে? মাঠে নেমে প্লেয়াররা যদি খেলতে না পারে···"

এবার আর সেই ভদ্রলোক নয়, আমার কথা শেষ হবার আগেই চারপাশ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে মন্তব্য ছিট্‌কে এল, "শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবেন না মশাই। ফুটবলের এই অবস্থার জন্যে আপনারাই দায়ী। আপনারা কেন এসব ফাল্‌তু প্লেয়ারদের নিয়ে মাতামাতি করেন, ছবি ছাপেন?" "যারা দেশের সম্মানের কথা ভাবে না, ফুটবলের কথা ভাবে না, যারা শুধু টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না, জানে না, কাগজে-কাগজে তাদের এত ইম্পর্টেন্স দেন কেন?" "ফুটবলাররা যেমন, আপনারাও তেমনি দেশের শত্রু।"

তরুণ দে'কে পিছনে ফেলে এগোচ্ছেন থাই-দলের স্ট্রাইকার সুন্‌থারা

ফুটবলারদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ঘেন্না জন্মেছিল দর্শকদের, সেটা যেন শিলাবৃষ্টির মতো অঝোরে ঝরে পড়েছিল আমার ওপর। প্রচণ্ড জনরোষের মুখে পড়ে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ফুটবলারদের সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস আজ কোন্ স্তরে নেমে গেছে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে আমারই দুই সাংবাদিক-বন্ধু কোনওক্রমে আমাকে উদ্ধার করলেন। উদ্ধার পেলাম ঠিকই, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে কেমন যেন ছোট হয়ে গেলাম। আমি খবরের কাগজে চাকরি করি না। তবে তোমাদের কাছে খেলার খবর পৌঁছে দেবার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছি অনেকদিন। ভেতর থেকে একটা আনন্দও পেয়েছি কাজ করতে করতে। এই ঘটনা নতুনভাবে নাড়া দিয়ে গেল আমাকে। সেই মুহূর্তে মনে হল এতদিন ধরে এদের নিয়ে যা-কিছু লিখেছি সবই কি তাহলে মূল্যহীন? এতদিন ধরে ফুটবলের স্বপ্ন-দেখা এক-একটি কিশোরের দু-চোখের সামনে তা হলে তুলে ধরেছি এই রকম আদর্শহীন কাণ্ডকারখানার ছবি!

ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে চেনা মাঠে, স্বদেশের জনসমুদ্রকে সঙ্গী করে একটি জয়ের জন্যে যেখানে আমাদের ফুটবলারদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল, সেখানে তারা পা গুটিয়ে নিল! একটিবারের জন্যেও এদের মনে পড়ল না, গায়ে জড়ানো জার্সিটি ভারতবর্ষের, তাদের দেশমাতৃকার! এ-কথা সত্যি বলে ভাবতে পারছি না, ফুটবলাররা তাঁদের মন থেকে আবেগ, ত্যাগ, ভালবাসার মতো সুন্দর, পবিত্র শব্দগুলো নিষ্ঠুরের মতো মেরে ফেলেছেন, সামান্য কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায়!

দুঃখ হচ্ছে, ভারতবর্ষের মাটিতে এই প্রথম বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল। বহু আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা দূরে থাক, এক মুহূর্তের জন্যেও ভারতীয় ফুটবলাররা জাগল না! কলকাতার দর্শকদের কথা ভেবে, ভারতবর্ষের কথা ভেবে ফুটবলারদের কি সত্যিই কিছু করার ছিল না? আমাদের ফুটবলারদের ধারাবাহিক যে ব্যর্থতার ছবি সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দেখলাম, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে জয়ী হয়ে সেই ছবিটাকে তাঁরা একটুও উজ্জ্বল করতে পারলেন কি?

সাত, আট আর নয়

রাজা গুপ্ত

মুখে যে যাই বলুন না কেন এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মনে মনে আমাদের সকলেরই একজন করে প্রিয় ক্রিকেটার আছেন। প্রতিবাদের ঝড় উঠবে কি, যদি বলা যায় অধিকাংশ ভারতীয়দের কাছে এখনও সবচেয়ে প্রিয় ব্যাটসম্যান সুনীল গাওস্কর! ঠিক এইভাবে হয়তো বেশিরভাগ ক্রিকেট-অনুরাগী আমাদের সেরা বোলার এবং সেরা উইকেট-কিপার হিসেবে কপিলদেব এবং কিরমানিকেই মেনে নেবেন। কিন্তু ব্যাটে, বলে, উইকেটকিপিংয়ে একাধিক রেকর্ড যাঁরা গড়েছেন, জানো কি, সবার প্রিয় সেই তিন ভারতীয় ক্রিকেটার তিনটি দারুণ রেকর্ডের মুখে থমকে আছেন? ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে টেস্ট সিরিজে হারের দুঃখ নিয়ে রান, উইকেট, ক্যাচ ধরার রেকর্ড নাড়াচাড়া করতে করতেই নজরে পড়ে গেল ব্যাপারটা।

এটা নতুন করে বলার নেই যে, গাওস্কর মানেই রানের হিমালয়। অগুন্তি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, ইণ্ডিয়ান রেকর্ড রয়েছে তাঁর ব্যাটে। অথচ অনেকেই হয়তো জানে না যে, শুধু ব্যাট নয়, গাওস্করের হাত দুটিও ভারতীয় ক্রিকেটে কতখানি মূল্যবান। সর্বাধিক ক্যাচ ধরার ভারতীয় রেকর্ডটাও আপাতত গাওস্করের তালুবন্দী। শুনলে অবাক হয়ে যাবে তাঁর ধরা ক্যাচের সংখ্যা পৌঁছেছে ন'য়ের ঘরে। যখন সানি মানেই সেঞ্চুরি, তখন গাওস্কর-অনুরাগীদের আশা ক্যাচ ধরার ব্যাপারেও সানি যেন তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরিটা সেরে নেন। আর মাত্র আটটি ক্যাচের অপেক্ষায় সানি-অনুরাগীদের রেখে সুতরাং কপিলের দিকে নজর ফেরানো যাক।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষে কপিলের উইকেট-প্রাপ্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৮। এ-যাবৎ ভারতীয় ক্রিকেটের বোলিং-দৌড়ে ২৬৬ উইকেট-পাওয়া বিষেন বেদীই ছিলেন এক নম্বরে। এখন মাত্র ন' কদম দূরে অপেক্ষমাণ বেদীর রেকর্ডের ঘাড়ে এসে পড়ছে কপিলের উত্তপ্ত নিশ্বাস। আর মাত্র নটা উইকেট পেলেই কপিল টপকে যাবেন বেদীকে, সেই সঙ্গে উঠে আসবেন এক নম্বরে। সুতরাং কপিলকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করার ইচ্ছেটুকু নিয়ে আপাতত কপিল-অনুরাগীদের অপেক্ষায় থাকতেই হচ্ছে।

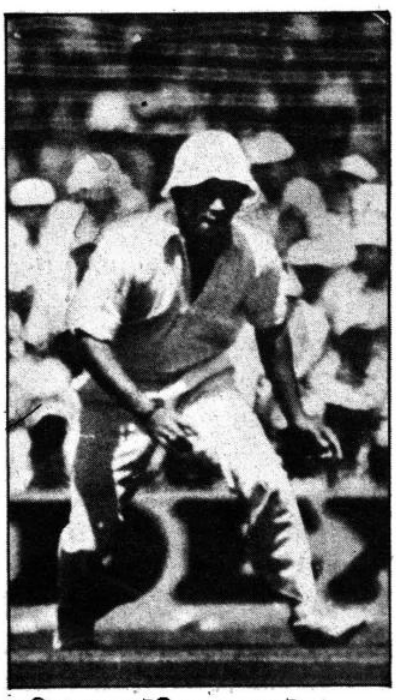

সানি (আর আটটি ক্যাচ ধরলেই···)

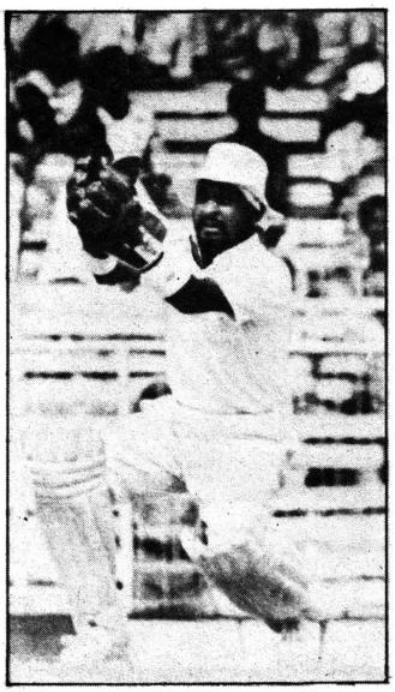

কিরি (আর সাতটি শিকার পেলেই···)

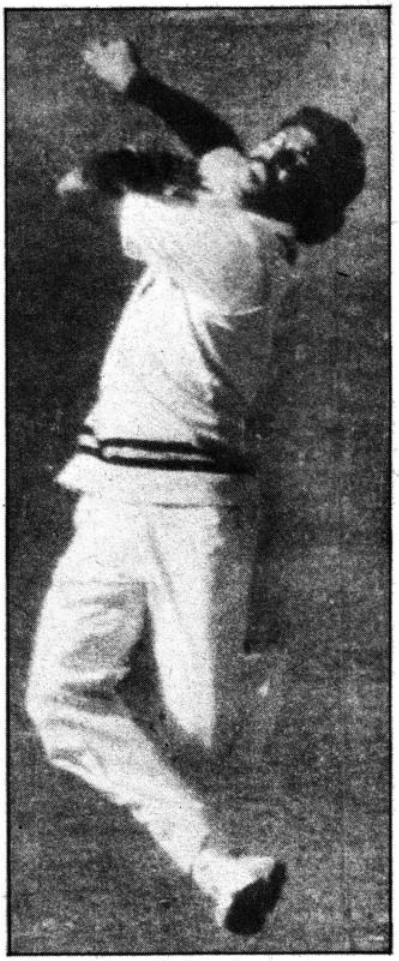

কপিল (আর ন'টি উইকেট পেলেই···)

সবশেষে সৈয়দ কিরমানি। উইকেট-কিপার হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর কোনও তুলনাই নেই। উইকেটের পেছনে দাঁড়ানো 'কিরি'র মাথায় একটিও চুল নেই। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত গ্লাভস দুটিতে জমা আছে অসংখ্য ব্যাটসম্যানের 'প্রাণ'। আপাতত টেস্ট-ক্রিকেটে কিরমানির শিকার সংগ্রহের পরিমাণ ১৯৩ (ক্যাচ ১৫৭, স্টাম্প ৩৬)। সুতরাং ক্যাচ অথবা স্টাম্পিংয়ে আর সাতটি শিকার পেলেই কিরমানি পৌঁছে যাবেন ডবল সেঞ্চুরিতে। এবং অর্জন করবেন দু-হাজার রান এবং দুশো 'ভিক্‌টিম' সংগ্রহের বিরাট কৃতিত্ব।

বুঝতেই পারছ, তিনটি নজিরই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সানি, কিরি, কপিল অনুরাগীরা ভাবতে শুরু করে দাও ৭, ৮, ৯ সংখ্যা তিনটি কত দ্রুত জমা করে দেওয়া যায় ওঁদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে।

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!
PONDS
Pond's
Dreamflower Soap
তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপুর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!
নতুন
পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান

ANANDAMELA 15 MAY. 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...

অন্য যে কোনো ডিটারজেণ্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন